KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ [illegible], কল- ১৬
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চড়ুই	Size 7"x9.5" 17.78X24.13 c.m.
Vol. & Number ৫/৯ ৫/১০ ৫/১১	Year of Publication পৌষ ১৩৯৮ // Jan 1992 মাঘ ১৩৯৮ // Feb 1992 ফাল্গুন ১৩৯৮ // March 1992
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রহিম	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ১১ মার্চ, ১৯৯২

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সন্ধিকালে দু-বছরব্যাপী ইউরোপবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা "বিনুর নিয়তি"।

পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চে আলো-অন্ধকার-রঙ নিয়ে যাঁর সৃজনশীলতা আজ কিংবদন্তী, সেই তাপস সেনের অনুসন্ধিৎসু মনে মহাবিশ্বমঞ্চের রঙ-আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তায় জেগে ওঠে যে "অবোধ শিশুর মুগ্ধ বিস্ময়," তাই নিয়ে তিনি লিখেছেন "আমারই চেতনার রঙে"।

প্রাক্তন প্রশাসক অশোক মিত্র হাতেকলমে পঞ্চাশের মন্বন্তর মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা বহু প্রাসঙ্গিক তথ্য-সহ বিশদ করেছেন "১৩৫০-এর মন্বন্তর ঃ বিক্রমপুর, ঢাকা" নামে আত্মজৈবনিক রচনায়।

লালনের প্রতি ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রবল বিরুদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে সুধীর চক্রবর্তীর এবারের অন্বেষার বিষয়, কেন তারা এত ক্ষিপ্ত?

খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ কুরুভিলা জ্যাকারিয়ার একটি গ্রন্থ প্রসঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা।

বাঙলা গান নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা।

মান্না দে'র গাওয়া কতিপয় জনপ্রিয় গানের শুদ্ধপাঠ।

একটি গল্পের অনুবাদ সহ উর্দুসাহিত্যের লেখিকা ইসমত চুগতাইয়ের অসামান্য সাহিত্যকৃতি নিয়ে আলোচনা।

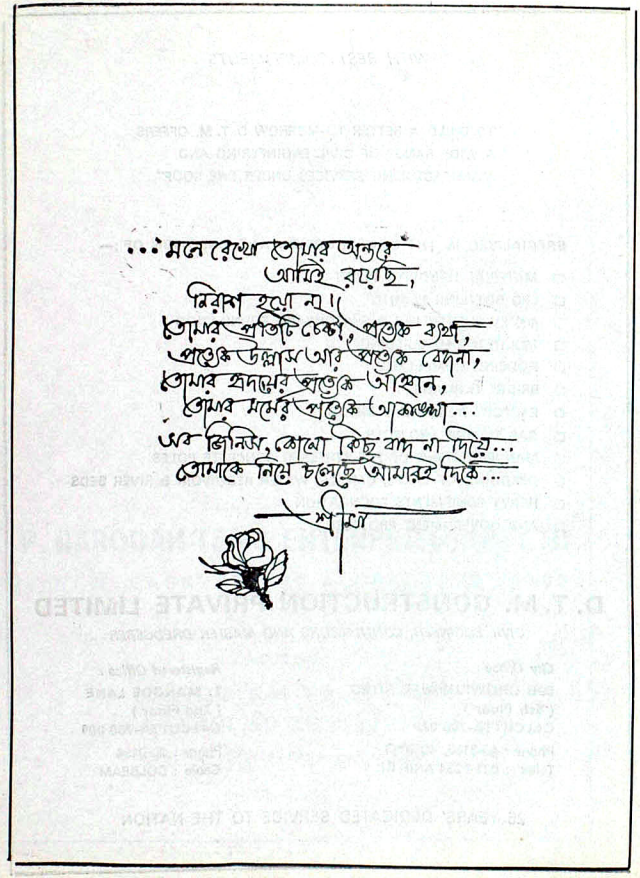

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ১১
মার্চ ১৯৯২
ফাল্গুন ১৩৯৮

বিস্তর নিয়তি অন্নদাশঙ্কর রায় ৮৫৩
আমারই চেতনার রঙে তাপস সেন ৮৬৪
১৩৫০-এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর, ঢাকা অশোক মিত্র ৮৭০
ব্রাত্য, মন্ত্রবজ্জিত লালন ফকির সুধীর চক্রবর্তী ৮৯৮

আশাকুসুমের জন্যে হরপ্রসাদ মিত্র ৮৬০
উপস্থিতি, অনুপস্থিতি সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ৮৬১
একুশে ফেব্রুয়ারি সৈয়দ শমিহুল আলম ৮৬২
দক্ষিণায়নে সূর্য সুজিৎ ঘোষ ৮৬৩

বিশেষ দিন অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ৮৮৯
মুষ্টি-মালিশ ইসমত চুগতাই ৯২৫

গ্রন্থসমালোচনা ৯১১
সুতাষরঞ্জন চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ রায়, তরুণ মুখোপাধ্যায়

প্রতিবেশী সাহিত্য ৯২০
ইসমত চুগতাই কমলেশ সেন

মতামত ৯৩০
দেবাশিস নাথ, মেদিনীপুর জেলার পাঁচজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সুরজিৎ দাশগুপ্ত

গানের ভুবন ৯৩৬
মান্না দে ও তাঁর গান বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Hindustan Wires Limited

Registered Office :

3A, Shakespeare Sarani, Calcutta-700 016

Phone : 44-6745 (3 lines) Telegram : WIREFIELD

Factory :

B. T. Road, Sukchar, 24 Parganas

Phone : 58-1947, 58-1934

Manufacturers of :

Stainless Steel Wires, Alloy Steel Wires, High Tensile Galvanised Steel Wires for ACSR to IS : 398 and High Tensile Wire for Prestressed Concrete to IS : 1785

And

Many other specialised High Carbon & Mild Steel Wires such as High Tensile, Spring Steel, Tyre Bead, Cable Armouring, Cycle Spoke, Umbrella Card & Gill Pin Wires and G. I., Annealed, Ball Bearing, Electrode Core Wires etc.

In Technical Collaboration with

MESSRS KOBE STEEL WORKS LIMITED &
MESSRS SINKO WIRE COMPANY LIMITED
JAPAN

বিনুর নিয়তি

অন্নদাশঙ্কর রায়

বারো বছর বয়সে "সবুজপত্র" পড়ার পর থেকে বিনুর মনে গেঁথে যায় চার-পাঁচটি আইডিয়া। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে সেগুলির বিকাশ হয়। একটি আইডিয়া হল প্রাচ্য প্রতীচ্য সমন্বয়। প্রতীচ্যে না গেলে, নিজের চোখে না দেখলে, লোকের সঙ্গে না মিশলে কেমন করে তার সঙ্গে সমন্বয় ঘটানো যায়? ইটারনাল ফেমিনিন আর-একটি আইডিয়া। তার অর্থ বুঝুক আর না বুঝুক সে তার সন্ধানে বেরোতে চায় রূপকথার রাজপুত্রের মতো সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে। আর-একটি আইডিয়া হল আর্ট। কথাটার মানে কী তা জানার জন্যে সে আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করে। টলস্টয়ের "আর্ট কী" পড়ার পর রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে যায়। আরো এক আইডিয়া অফুরন্ত যৌবন। কায়িক অর্থে নয়, মানসিক অর্থে। এর অর্থ অনুধাবন করতেও আরো কয়েক বছর লাগে। যে আইডিয়াটা সবচেয়ে আগে কাজে পরিণত করা সম্ভব হল সেটা চলতি বাঙলায় লেখা সাহিত্যকর্ম। বিনু ষোলো বছর বয়সেই চলতি বাঙলায় টলস্টয়ের একটি উপকথা অনুবাদ করে ছাপায়।

সে সতেরো বছর বয়সে বাড়ি থেকে রওয়ানা হয়েছিল আমেরিকার অভিমুখে সমুদ্রপথে। পাগলামি! কলকাতা থেকে ফিরে এসে কলেজে ভর্তি হয়। কথা ছিল গ্রাজুয়েট হয়েই কলকাতা ফিরে গিয়ে সাংবাদিকতায় ব্রতী হবে ও পরে এক সময় আমেরিকায় যাবে। কিন্তু গ্রাজুয়েট হয়ে সে ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় সফল হল। এখন তাকে যেতে হবে শিক্ষানবিশির জন্যে বিলেতে, সেখানে থাকতে হবে দু-বছর। এও তো সেই সমুদ্রযাত্রা। যদিও আমেরিকা অভিমুখে নয়, ইউরোপ অভিমুখে। হ্যাঁ, এটাও তার মনের আড়ালে কাজ করছিল। বারো বছর বয়সে "চার ইয়ারি কথা" পড়ার পর থেকে। ইউরোপে না গেলে সে কোথায় দেখা পাবে Venus de Milo-র। আমেরিকার লিবার্টি মূর্তি তার সমতুল্য নয়। কলেজে গিয়ে বিনু ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস বুঁদ হয়ে পড়ে। সেই সূত্রে ইউরোপ তাকে চুম্বকের মতো টানে। ইউরোপে যাবার সুযোগটা এনে দেয় প্রতিযোগিতা। সফল না হলে সে সাংবাদিক ব্রতেই ফিরে যেত। তার কাছে সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি নয়, একটা ব্রত। "ইটারনাল ভিজিলান্স ইজ দ্য প্রাইস অভ্ লিবার্টি।" স্বাধীনতার মূল্য অতন্দ্র প্রহরা। সৈনিকদের মতো সংবাদপত্রকাররাও দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করে বলে বিনু সেই ব্রত বেছে নিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সে উপলব্ধি করেছিল যে তার

লেখনী সাংবাদিকের নয়, সাহিত্যিকের লেখনী। সে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর পন্থী। তাই সাংবাদিকতার মায়া কাটাতে কষ্ট হয় না। একটি বিশিষ্ট মাসিকপত্রে ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী লেখার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেয়। জাহাজে ওঠার আগেই লিখতে শুরু করে। বিলেত থেকে প্রতি মাসেই এক-একটি কিস্তি পাঠায়।

দেশ থেকে বিদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল প্রিয় নারীর সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষাদ। আর সেই বিষাদের সঙ্গে মিশেছিল মুক্তির স্বাদ। সে ফিরে পেয়েছে তার প্রেমে পড়ার স্বাধীনতা। হয়তো আবার প্রেমে পড়বে। কে জানে কোনো এক দেবযানীর সঙ্গে সেকালের সেই কচের মতো। বিন্নু তার হৃদয়ের দুয়ার খোলা রেখেছিল। তার মনের দুয়ার তো খোলা ছিলই। নতুন দেশের জন্যে, নতুন মানুষের জন্যে, নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। তবে ইউরোপ তার কাছে পুরোপুরি নতুন নয়। অসংখ্য বই পড়ে, পত্রিকা পড়ে সে ইউরোপের মানসের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। যতসব উপন্যাসের নায়কনায়িকা তার চেনা। দেশে থাকতেও ইংরেজ অধ্যাপকদের সংস্পর্শে এসেছিল। ইংরেজ লাটসাহেবের হাত থেকে সোনার মেডাল পেয়েছিল।

বিন্নুকে যিনি পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছিলেন তিনি একজন অ্যাংলো-ইনডিয়ান লেডি ডাক্তার। বিলেত যাবার আগে সে যায় তাঁর আশীর্বাদ নিতে। তিনি বলেন, 'তুই ওদেশের মেয়েদের পাল্লায় পড়বি না তো? জানিস্ ওদেশের মেয়েরা কেন এত ফরসা হয়? ফল। খুব ফল খায় ওরা। আপেল। আপেল খেয়েই ওরা হয় এত ফরসা। তুইও যত পারিস্ আপেল খাস্।' বিন্নু হাসিমুখে বিদায় নেয়। তার মনে পড়ে অ্যাডামকে এই পরামর্শ দিয়েছিলেন ইভ।

তার জন্মকাল থেকেই বিধাতার নির্বন্ধ সে একদিন পশ্চিম যাত্রা করবে। সেটা সতেরো বছর বয়সে সম্ভব না হয়ে তেইশ বছর বয়সে হল। জাহাজের ডেকে পা রেখে বিন্নু ভুলতে আরম্ভ করল ভারতকে, ভাবতে আরম্ভ করল ইউরোপকে। যতদিন ইউরোপে থাকবে ততদিন পুরোপুরি ইউরোপের ভাবনাই ভাববে। দুনিয়াকে দেখবে ইউরোপীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। অথচ লিখবে বাঙলা ভাষায়। বাঙালি পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে। এমনি করে দু বছর কাটাবে।

তার জীবনে কত দু বছর এসেছে গেছে। কিন্তু সেই দু বছরের মতো আর কোন দু বছর নয়। দেশে ফিরে আসার পরও সেই দু বছর তাকে আবিষ্ট করে রাখে আরো বারো বছর। সেই দু বছরের পটভূমিকায় পাঁচ খণ্ডের উপন্যাস লিখতে বসে ছয় খণ্ডের উপন্যাস লেখে। একে নিয়তি না বলে আর কী বলা যেতে পারে?

সাত সাগর পারে নয়, তিন সাগর—আরব সাগর, লোহিত সাগর, ভূমধ্য সাগর—পারে বিন্নুর জাহাজ ছোঁয় ফ্রান্সের বন্দর মার্সেলস। সেই জাহাজেই বিন্নু লনডন অবধি যেতে পারত, কিন্তু তার সতীর্থদের সঙ্গে সেও নেমে পড়ে। এই সেই মার্সেলস যেখানে রচিত হয়েছিল বিপ্লবগীতি "লা মার্সেইলেস"। বিপ্লবের প্রাক্কালে। বিপ্লবের প্রেরণা দিতে। এখনো ফরাসিদের জাতীয় সঙ্গীত। বিন্নু ফ্রান্সের মাটিতে পা রেখে শিহরণ বোধ করে।

প্যারিসে ট্রেন বদল। ফরাসি বিপ্লবের স্মৃতি। রোমাঞ্চ। ক্যালে থেকে জলপথে ডোভার। ইংল্যানডের মাটি। বিন্নুর কতকালের স্বপ্ন সার্থক। এর পরে রেলপথে লনডন। বিন্নু আনন্দে অধীর। ইতিমধ্যেই সে স্থির করেছিল অক্সফোর্ডের একটি প্রসিদ্ধ কলেজে সীট পেলেও লনডনেই থাকবে। সে তো ডিগ্রি চায় না। শিক্ষানবিশি লনডনেও করা চলে। লনডন শুধু সাম্রাজ্যের রাজধানী নয়, বিশ্বনাগরিকধানী। সে সব কিছু দেখতে, সব কিছু শুনতে, সব কিছু জানতে চায়। থিয়েটার, অপেরা, ব্যালে, কনসার্ট,

মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি, স্টুডিও, সভাসমিতি, হাইড পার্ক, পার্লামেনট, সেনট পলস। জীবনে এমন সুযোগ আর মিলবে না। দু বছর লনডনবাস। কিন্তু তার হিতৈষীদের চক্ষে সে একটা বোকা ছেলে। ভারতের হাই কমিশনার সার অতুল চ্যাটার্জি একদিন তাকে বকুনি দেন। 'অক্সফোর্ড ছেড়ে লনডন। এক্ষুনি যাও।'

বিন্নু ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠাগারে পড়ার জন্যে কার্ড জোগাড় করে। সময় পেলেই সেখানে গিয়ে বিচিত্র বা নিষিদ্ধ পুস্তক পড়ে। একটি গুপ্ত কক্ষে প্রহরীসমেত যাতায়াত করতে হয়। শিক্ষানবিশির অঙ্গ নয় এটা। শিক্ষানবিশ হিসাবে তাকে যেতে হত চারটি কলেজ ও কলেজসদৃশ স্কুলে। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লনডন স্কুল অভ ইকনমিকস, লনডন স্কুল ফর ওরিয়েনটাল স্টাডিজ। তা ছাড়া, তাকে উচ্চ ও নিম্ন আদালতে গিয়ে মামলার বিচার শুনতে ও টুকে রাখতে হয়। মাঝে-মাঝে উলউইচে গিয়ে ঘোড়ায় চড়তে হয়। কিন্তু এহো বাহ্য। তার আসল কাজ হল তার সহকর্মী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া। সাভিসটার ব্রিটিশ চরিত্র যেন বজায় থাকে। ওটা নামেই ইনডিয়ান।

কিন্তু বিন্নুর কাছে জীবিকার চেয়ে জীবন বড়ো। তাই সে যত কম সময় সম্ভব তত কম সময় শিক্ষানবিশিকে দিয়ে বাকিটা দেয় জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে। ডিকেন্স প্রতিদিন লনডনের পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতেন। বিন্নু প্রত্যহ না হলেও প্রায়ই পথে-পথে ঘোরে। তবে বাসায় ফিরতে রাত করে না। সে চেয়েছিল কোনো এক ইংরেজ পরিবারে পেয়িং গেস্ট হতে। কিন্তু তার এক বন্ধুর অনুরোধে তার দিদির ও জামাইবাবুর সঙ্গে মিলে ফ্ল্যাট ভাড়া করতে হয়। ফলে সে বাঙালিই থেকে যায়, ইংরেজ বনে না। এতে সাহিত্যের সুরাহা হয়। ওঁদের অগণ্য বাঙালি বন্ধু-বান্ধবী বাঙালি সমাজে। বিন্নু তাঁদের সঙ্গ পায়। তার উপন্যাসের বহু চরিত্রের মডেল আপনি জোটে। না, উপন্যাস সে লনডনে বসে লেখে না। দেশে ফিরে এসে লিখবে। ইংল্যানডে লেখা হয় ভ্রমণকাহিনী ছাড়া কবিতা ও প্রবন্ধ, গল্প ও নাটিকা। পরে সে ইংরেজ পরিবারেও পেয়িং গেস্ট হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সে তেমন বন্ধুসমাগম দেখে নি।

কলেজের অবকাশে বিন্নু বেরিয়ে পড়ত লনডনের বাইরে সাগরতীরে বা ভিন্ দেশে। প্রথম অবকাশেই সে চলে যায় সুইটজারল্যানডে রম্যা রলাঁর সন্নিধানে। তাঁর এক অগ্রজপ্রতিম সাহিত্যিক বন্ধু সে সময় সুইটজারল্যানডপ্রবাসী ছিলেন। তিনিই হন দোভাষী। বিন্নুর সেই একই জিজ্ঞাসা, যা নিয়ে সে রবীন্দ্র-সন্দর্শনে গিয়েছিল কলেজজীবনে। 'আর্ট কি এতই ভালো যে মানবপ্রকৃতির প্রতিদিনের আহার্য হতে পারে না?'

'কেন হতে পারবে না?' রলাঁ উত্তেজিত হয়ে উত্তর দেন, 'রেনেসাঁসের যুগে ইটালির কারিগররা সাধারণ মানুষের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী সুন্দর করে বানাত। সকলে তা উপভোগ করত।'

রবীন্দ্রনাথের উত্তর ছিল এর বিপরীত। রলাঁ "পীপলস থিয়েটার" বলে একখানি বই লিখেছিলেন। বিন্নু জানত জনগণের প্রতিই তাঁর টান। কিন্তু উচ্চতর গণিত কী করে তারা বুঝবে, যদি তার উপযোগী প্রস্তুতি না থাকে? বিন্নু রলাঁর সঙ্গে তর্ক করে না। তিনি তাঁর স্বমতে অটল। আর বিন্নুও জনগণের কাছে পৌঁছতে উৎসুক।

বিন্নুর অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রলাঁ বলেন, 'হ্যাঁ, সাহিত্যিক সমসাময়িক প্রশ্ন নিয়ে লিখবেন বইকি। শেক্সপীয়ারও লিখেছেন।'

বিন্নু শেক্সপীয়ার যেটুকু পড়েছিল সেটুকুতে তা লক্ষ করে নি। হয়তো নাট্যকার তির্যকভাবে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন।

আরো কয়েকটি বিষয়ে কথাবার্তা হয়। বিদায় দেবার সময় রলাঁ বলেন, 'আপনি টাকার জন্যে আর

কিছু করবেন, নিজের খুশির জন্যে লিখবেন।'

আর্ট নিয়ে বিন্নুর ভাবনাচিন্তা সেইখানেই শেষ হয়ে গেল না। কাদের জন্যে লিখবে তার চেয়ে বড়ো কথা কী লিখবে। বিষয়বস্তুটা কী? যেখানে বলবার বিষয় নেই সেখানে বাগ্‌বিস্তার কি সাহিত্য? তার পরে আরো এক জিজ্ঞাসা। কেমন করে লিখবে? যেমন তেমন করে লিখতে অনেকেই পারে। তারা সবাই কি সাহিত্যশিল্পী? না, জনগণের জন্যে লিখলেও শিল্পী হওয়া যায় না, যদি কেমন করে লিখতে হয় তা না জানে। বিন্নু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। লেখাও একপ্রকার রান্না। রান্নাও একপ্রকার কলা। থিওরি জানাই যথেষ্ট নয়। প্র্যাকটিস চাই। আর্ট হওয়া না হওয়া নির্ভর করে প্র্যাকটিসের উপর।

ফেরার পথে প্যারিসে বিন্নু লুভর মিউজিয়াম দেখতে যায়। সেখানে দর্শন পায় Venus de Milo-র। এই সেই ইটারনাল ফেমিনিন। গ্রীক ভাস্কর্যের অপরূপ নিদর্শন। এমনি কিছু নিদর্শন দেখেই রেনেসাঁসের ভাস্কররা উদ্দীপিত হন। তাঁরা সাধারণ কারিগর ছিলেন না। তাঁদের সৃষ্টিও নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রী নয়। রলাঁ কী বলবেন একে? অপর একটি কক্ষে মোনা লিসা। লেওনার্দো দা ভিঞ্চির রহস্যময়ী নারীর প্রতিকৃতি। বিন্নু রহস্যভেদ করতে পারে না। জনগণ কী করে পারবে!

অগস্ত্য ঋষি এক গণ্ডূষে সমুদ্র পান করেছিলেন। বিন্নুরও অভিলাষ দু বছরে ইউরোপ গ্রাস। পরে একটি অবকাশে সে বেরিয়ে পড়ে তার সেই অগ্রজপ্রতিম বন্ধুর সঙ্গে জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ইত্যাদি বেড়াতে। থিয়েটার, অপেরা, জাদুঘর, ক্যাথিড্রাল কত কী দেখা হয়। মানুষও চেনা হয় পথে, হোটেলে, হসপিসে, পাঁসিঅঁতে! খাদ্য অখাদ্য কত কী খাওয়া হয়। মিউনিকের বীয়ার-হলে বীয়ার পান। হিটলারের প্রিয় স্থান। তখন কিন্তু নাৎসি নায়কের নাম কেউ বলেন নি।

বিন্নু যে দু বছর ইউরোপে ছিল সে সময়টা ছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সন্ধিকাল, ১৯২৭ থেকে ১৯২৯। চার বছর ধরে মানুষ একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করেছিল। তার কুপ্রভাব থেকে জেগে উঠছে। ভাবতেই চায় না যে আবার এক দুঃস্বপ্ন অবশ্যম্ভাবী। দশ বছর পরে নেমে আসবার অপেক্ষায় আছে। মুসোলিনি ইতিমধ্যেই ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ জারি করে দেখিয়ে দিয়েছেন গণতন্ত্র কত ঠুনকো। ওদিকে রাশিয়াতে বিপ্লবী জমানা। জার্মানির কমিউনিস্টরা চান তার সম্প্রসারণ। সোশ্যাল-ডেমক্রাট সরকার আন্তর্জাতিক ঋণ শোধ করতে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতিতে হিমশিম খাচ্ছেন। লোকের ধারণা ওই পরিস্থিতির সুযোগ নিচ্ছে ইহুদি ব্যবসায়ীরা। সন্দেহ তামাম ইহুদি জাতিটাকে। তারাও জাতি হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। আর্য জাতীয়তায় বিশ্বাসী জার্মানদের সঙ্গে বেজোড়। তেল আর জল।

লনডনে কয়েকজন শান্তিবাদীর সঙ্গে বিন্নুর পরিচয় হয়। এঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ফ্রেনডস অভ দ্য লীগ অভ নেশনস। এঁদের বিশ্বাস লীগ যদি শক্তিশালী হয় তবে যুদ্ধ বাধবে না, বাধলে থামাতে পারা যাবে। কিন্তু লীগের সদস্য-নেশনদের মধ্যে না আছে আমেরিকা, না রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন, না জার্মানি। অথচ ভারত রয়েছে। ভারতের প্রতিনিধি জাস্টিস সার বসন্তকুমার মল্লিক ছিলেন জাহাজে বিন্নুর সহযাত্রী। তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সিভিল সার্ভিসের সুবাদে। সার্ভিসের ভিতরে থেকে দেশের কাজ করা সম্বন্ধে।

লীগের বন্ধুজনদের মধ্যে ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা। অসমবয়সিনী কুমারী। চিত্রকর। ভারত-হিতৈষিণী। তাঁর সঙ্গে বিন্নুর সম্পর্ক একটু-একটু করে পরিণত হয় বন্ধুতায়। তাঁর সৌজন্যে ব্রিটেনের উচ্চ-বংশীয় সমাজসেবীদের সঙ্গে বিন্নুর মেলামেশা সম্ভব হয়। তাঁদের অনেকেই মানবদরদি। অনেকেই ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে। তবে তাঁদের একজনের প্রশ্ন হল ভারত স্বাধীন হলে দেশীয় রাজাদের ভাগ্যে কী আছে। দেশীয় রাজ্যে বিন্নুর জন্ম। রাজবংশের সঙ্গে সদ্ভাব। তবু সে একটা কঠোর উক্তি করে। রাজাদের জোর করে ফেডারেশনভুক্ত করতে হবে। তিনি মিষ্টি করে বলেন, 'না, না, ওঁদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে।'

বান্ধবীর বান্ধবী মুরিয়েল লেস্টার তাঁর যুদ্ধে নিহত ভ্রাতা কিংসলির নামে লনডনের ইস্ট এনডে একটি "সেটলমেনট" স্থাপন করে তার নাম রেখেছেন "কিংসলি হল"। গরিব এলাকায় শ্রমিকশ্রেণীর জীবনের শরিক হবার জন্যে উচ্চশ্রেণীর পুরুষ বা মহিলারা এ রকম আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে বসবাস করেন। তাঁদের জীবনযাত্রা একান্ত সাদাসিধে। সংসারের বন্ধন নেই। একদা শ্রমিকদলের নেতা অ্যাটলি থাকতেন এইরকম একটি সেটলমেনটে। মুরিয়েল কিন্তু পলিটিকসের ধার ধারেন না। অথচ ধর্মেরও বাধ্যতা নেই। একনিষ্ঠ মানবহিতৈষী সেবাকর্মী। বিন্নুর বান্ধবী একদিন তাকে মুরিয়েলের আশ্রমে নিয়ে যান। সেটা এক হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের ক্লাব। অবসর পেলেই তারা সেখানে এসে খেলাধুলো করে। গানবাজনাও হয়। নির্দোষ আমোদপ্রমোদে মুরিয়েল তাদের সাথী। বাসযোগ্য কয়েকটি সেল ছিল। বিন্নু তার একটিতে শুয়ে রাত কাটায়। দু বছর বাদে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর দলবল সেইখানেই মুরিয়েলের অতিথি হন। রাউনড টেবল কনফারেন্সের সময় ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হন নি। পার্টিশনের পূর্বে মুরিয়েল এসেছিলেন ভারতে। বলেছিলেন, 'এই ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করো। হিন্দু মুসলমান ভাই-ভাই।'

অ্যাটলি ছিলেন ফেবিয়ান সোশ্যালিস্ট। তাঁরই মতো সোশ্যালিস্ট সিডনি ওয়েব শ্রমিকদের প্রগতির কথা চিন্তা করে লনডন স্কুল অভ্ ইকনমিক্স প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে সেটি মধ্যবিত্তদেরও সুশিক্ষার অন্যতম পীঠস্থান হয়। বিন্নু সেখানে লেকচার শুনতে যায়। তখনো অন্যান্য কলেজে তরুণ-তরুণীদের সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয় নি। এখানে হয়েছে। বিন্নুর সঙ্গে যাঁরা ক্লাস করেন তাঁরা তার সমবয়সিনী। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির সন্ধান করবেন। আগে চাকরি, তারপরে বিবাহ। যদি বর জোটে। বিন্নু "নিউ উওম্যান" দেখতে চেয়েছিল। নিউ উওম্যানকে দেখল। যে নারী পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পড়াশুনা করে। তাকে হারিয়েও দিতে পারে। লনডন স্কুল অভ ইকনমিকসে একজন অধ্যাপিকা ছিলেন। তিনিও বিন্নুকে পড়াতেন। নারীস্বাধীনতা ও নারীপুরুষের সাম্য দুটোই ছিল ফেমিনিস্টদের অন্বিষ্ট। দুটোরই দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করে বিন্নু অতিশয় প্রীত।

একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে সে মায়ের আদরযত্ন পায়। মা সব দেশেই মা। ইতিমধ্যে এক তটবর্তী শহরে বেড়াতে গিয়ে সে তার বোর্ডিং হাউসের কর্ত্রীর সঙ্গে মাতৃসম্পর্ক পাতিয়ে এসেছে। তিনি হয়েছেন তার দ্বিতীয় মাতা। অথচ তিনি বিয়েই করেন নি। এখন যাঁর বাড়িতে পেয়িং গেস্ট তাঁর ভাগ্নী একদিন বেড়াতে আসে। দু জনের দু জনকে এত ভালো লেগে যায় যে সেইদিনই ওরা ভাইবোন পাতিয়ে বসে। পরে আর দেখা হয় না। কিন্তু চিঠিপত্রে ভাইবোন মতবিনিময় করতে থাকে। বিদুষী কন্যা। শিক্ষিকা হয়। পরে বিয়েও করে। কিন্তু চাকরি ছাড়ে না।

দেশ এক নয়, ভাষা এক নয়, ধর্ম এক নয়, বর্ণ এক নয়, তা সত্ত্বেও মানুষে মানুষে এত বেশি মিল যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বলে দুটো আলাদা সত্তা শনাক্ত করা যায় না। একথাও বলতে পারা যায় না যে প্রাচ্য চিরদিন প্রাচ্য আর প্রতীচ্য চিরদিন প্রতীচ্য, মিলন তাদের কোনোদিন হবে না। কিপলিং-এর এই উক্তি যেমন অসার তেমনি অসার ভারতীয় মনীষীদের ধারণা যে প্রাচী হচ্ছে অধ্যাত্মবাদী আর প্রতীচী জড়বাদী। কোলোনের ক্যাথিড্রাল আর প্যারিসের নোতরদাম পরিদর্শন করে বিন্নু উপলব্ধি করে ইউরোপের মানুষও এশিয়ার মানুষের মতোই

ধর্মপ্রাণ। মন্দির, মসজিদ, গির্জা তার সাক্ষ্য।

আসলে যেটা ঘটেছে সেটা ইউরোপের রেনেসাঁস, রেফরমেশন, এনলাইটেনমেনট, ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বিপ্লব, ফ্রান্সের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব, পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লব, রুশ দেশের সমাজবিপ্লব। এসব না ঘটলে ইউরোপ এগিয়ে যেত না, এশিয়া পেছিয়ে থাকত না, অগ্রসর আর পশ্চাৎপদের বৈষম্যকে আধ্যাত্মিকতা বনাম জড়বাদের বৈপরীত্য বলে রায় দিত না। প্রভেদটা আসলে মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। পশ্চাৎপদরাও ক্রমে অগ্রগামীদের ধরে ফেলবে। হয়তো ছাড়িয়ে যাবে। যেমন জাপানে।

কিন্তু সেটার জন্যে চাই জরা সংযুবনী শক্তি। বিষ্ণু দেখতে পায় যুবকরা নিজেরাই দ্বিধাগ্রস্ত। একদল যদি চায় সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আরেকদল ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে উন্নয়ন। এই দ্বিধা একদিন দ্বন্দ্বের রূপ ধারণ করতে পারে। সে দ্বন্দ্ব লনডনের ইস্ট এনডের সঙ্গে ওয়েস্ট এনডের। কিপলিং যা বলেছেন তা ইস্ট বনাম ওয়েস্ট নয়, ইস্ট এনড বনাম ওয়েস্ট এনডের বেলায় খাটতে পারে। গৃহযুদ্ধ করবে ধনী ও দরিদ্র নগর ও অঞ্চল। "সেটলমেনট" স্থাপন করে হ্যাভ-নট শ্রেণীকে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। হ্যাভ শ্রেণীকে ধনসম্পত্তি ভাগ করার কাজে ব্রতী হতে হবে। সেটা কি স্বেচ্ছায় হবে?

শেষের ক'দিন সুধায় গেল ভরে। বিষ্ণুর বান্ধবী তাকে নিয়ে গেলেন হল্যানড হয়ে জার্মানিতে, সেখান থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাঁর বান্ধবীর সমীপে, সেখান থেকে আবার জার্মানিতে। তার আগে দেখা হয়ে গেল গ্যেটের ভাইমার। বার্লিন তেমন পছন্দ হয় নি। কিন্তু ড্রেসডেন বিষ্ণুর হৃদয় হরণ করল। ইটারনাল ফেমিনিন রাফেলের আঁকা সিস্টিন মাডোনা। যীশুজননী। অতুলনীয়। জার্মানি থেকে বিষ্ণু লনডনে ফিরে যায়, প্যাট গুটিয়ে আবার বান্ধবীর সঙ্গে যোগ দেয় ইটালির মিলান নগরে। দেখতে পায় লেওনার্দোর আঁকা দেওয়াল-চিত্র যীশুর শেষ ভোজন। অপূর্ব। ভেনিস আর ফ্লোরেন্সের বিভিন্ন মিউজিয়ামে তাঁর আমলের আরো অনেকের কালজয়ী চিত্রসম্পদ, ভাস্কর্যসম্পদ। পরিশেষে রোম। ভাটিকানে সেনট পিটার গির্জায় মিকেল আঞ্জেলোর আঁকা সিলিং চিত্র। ঈশ্বর অ্যাডামের আঙুলে আঙুল ছুঁইয়ে প্রাণ সঞ্চার করছেন। সেই শিল্পীর গড়া মোজেস মূর্তি দেখল রোমের অন্য এক গির্জায়।

এসব অনবদ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি রেনেসাঁস আমলের। স্রষ্টারা ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মমতে গভীর বিশ্বাসী। রেফরমেশন আমলে প্রটেস্টানট ধর্মমতে বিশ্বাসী শিল্পীরা ধর্মীয় বিষয়ে মন দেননি। কিন্তু প্রটেস্টানট সঙ্গীতকাররা সে অভাব পূরণ করেছেন কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে মহৎ সঙ্গীত সৃষ্টি করে।

এনলাইটেনমেনটের আমলে ইউরোপ সেকুলার ধারা অবলম্বন করে। ধর্মবিশ্বাস আর তেমন প্রেরণা জোগায় না। প্যারিসই হয়ে ওঠে আর্টের কেন্দ্রস্থল। সঙ্গীতের কেন্দ্র কোনো এক স্থলে নয়। তবে জার্মানি ও অস্ট্রিয়াই সেরা সঙ্গীতকারদের সাধনাভূমি। বিষ্ণু প্যারিসে বেশি সময় দিতে পারে নি। তার বান্ধবীও সময় পান নি সেখানে নিয়ে যাবার। সঙ্গীতে তার বিশেষ আভিনিবেশ থাকলেও বিষ্ণু পাশ্চাত্য সঙ্গীত আদপেই বুঝত না। হ্যাঁ, সঙ্গীতে প্রাচ্য প্রতীচ্য ভেদ আছে বইকি। নৃত্যেও। বিষ্ণু বিভিন্ন সময়ে পাভলোভার ব্যালে দেখেছে, পাডেরেভস্কির পিআনো শুনেছে। তার পরে শুনেছে ক্রাইজলারের বেহালা, শালিয়াপিনের কণ্ঠসঙ্গীত। অসাধারণ, অসামান্য, কিন্তু বিষ্ণুর পক্ষে দুরূহ। বুঝতে হলে তাকে আরো কয়েক বছর ইউরোপে বাস করতে হত।

মনীষীদের সংসর্গও সে কলেজের বাইরে বড়ো একটা পায় নি। কারণ তাঁদের বাড়ি যায় নি। পাবলিক লেকচার শুনেছে বার্নার্ড শ আর বারট্রানড রাসেলের। দুই মহীরুহের। আরো কিছুকাল থাকতে পারলে ফরাসি ও জার্মান বনস্পতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত। আর ইটালিতে বেনেদেত্তো ক্রোচের সঙ্গে।

তার নিজের লেখার কাজও তো ছিল। দু বছরে যা লিখেছে তা দিয়ে চারখানা কবিতার বই, দুখানা ভ্রমণের বই, একখানা প্রবন্ধের বই দেশে ফেরার আগে ও পরে ছাপা হয়ে যায়। হাতে থাকে এত বেশি মালমশলা যে প্রথমে ভাবে তিন খণ্ডের উপন্যাস লিখবে তাই দিয়ে, পরে পাঁচ খণ্ডের। কিন্তু তাতেও কি সব কথা বা সকলের কথা বলা হবে? আত্মীয়তা সে পাতিয়েছিল অচেনা অজানা কত লোকের সঙ্গে জার্মানিতে, ফ্রান্সে, চেকোস্লোভাকিয়ায়। ক্ষণিকের জন্যে। সেসব তো তার উপন্যাসের ফ্রেমে আঁটা যাবে না।

তার বান্ধবী তাকে রোম থেকে মার্সেলসে রেলপথে রিভিয়েরার ভিতর দিয়ে নিয়ে যান ও জাহাজে উঠিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান। আবার সেই বিষাদ, আবার সেই আনন্দ। বিদায়ের বেদনা, ঘরে ফেরার উল্লাস। বিষ্ণু জাহাজের ডেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফ্রান্সের উপকূল ধীরে-ধীরে মিলিয়ে যায়। ইউরোপ হয়ে যায় মায়া।

বাঙলা, ওড়িয়া এবং ইংরাজি ভাষার লেখক, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্ম ১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ, ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। খ্যাতিমান প্রাক্তন আই· সি· এস· অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর সাহিত্য-কৃতির জন্য বিভিন্ন সময়ে বিশ্বভারতীর দেশিকোত্তম উপাধি, সাহিত্য অ্যাকাদেমি পুরস্কার, বিদ্যাসাগর পুরস্কার ইত্যাদি সহ ভারত সরকারের পদ্মভূষণ সম্মান দ্বারা ভূষিত হন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা বইয়ের সংখ্যা শতাধিক। এর মধ্যে বাঙলা ভাষায় স্মরণীয় লেখা হল ছয় খণ্ডে সমাপ্ত "সত্যাসত্য" উপন্যাস। বাঙলা ভাষায় তিনি প্রসিদ্ধ ছড়াকার। তাঁর রচিত কিছু-কিছু ছড়ার লাইন কিংবদন্তী হয়ে গেছে। "সবুজ অক্ষর" ওড়িয়া ভাষায় অন্নদাশঙ্করের লেখা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁর ইংরাজি ভাষায় স্মরণীয় রচনা *An Outline of Indian Culture*।

আশাকুসুমের জন্যে

হরপ্রসাদ মিত্র

তেমন কোনো শব্দ যাতে ছবি ও গান মিশে
সোনারুপোর বৃত্তটেউ তোলে হৃদয়জলে
খুঁজে মেলে না, খুঁজে মেলে না,—মন খারাপ খুবি
অবসাদের চাপে ঘড়ির ছুটো-কাঁটাই স্থির।

অনেক সব ঘটনা গেল পূর্ব-ইয়োরোপে,
গোরবাচেভ একা বড়োই শীতের মস্কোতে,
ওভারকোটে বরফ তাঁর মঞ্চ গেছে সরে—
এ-ঘটনাই সর্বাধিক ছিল ডিসেম্বরে।

ভীষণ তোলপাড়ের ফলে হারায় সুস্থিতি।
এখন সারা দুনিয়াতেই বাজারমুখী চোখ।
সুফল কিছু ঘটবে তাতে—অনেকে বলেছেন।
কিন্তু তাতে এ-পৃথিবীতে মৃত্যু আর প্রেম
কে জানে কোথা কবে আবার বাজাবে বিগ্-ব্যাং?

এ-ঘর থেকে ও-ঘরে তাই চলেই পায়চারি।
বেদান্তের একের ধ্যানও কখনো মন চায়,
ইন্দ্রিয়ের আঘাতগুলো তাও কি ভোলা যায়—
যেমন আজ টাকার দামে উৎরাইয়ের ঢল
খুঁজে মেলে না বালিয়াড়িতে আশাকুসুমবীজ।

কবিতা নেই, কবিতা নেই মিছে পলাশচাষে।
না যদি ফোটে আশাকুসুম কেন বা তবে প্রাণ?

উপস্থিতি, অনুপস্থিতি

(ইভ বনফোয়া, প্রিয়বরেষু)

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

দিনের আলোয় অথবা রাতের নিঃশব্দ অন্ধকারে
সন্ত্রান্ত ভাবনা এক সময় মুখোমুখি দাঁড়াতে চায়।
খোঁজার কথা ওঠে নি। তল্লাশও কেউ করে নি।
বা চিৎকার করার কথা কারো মনে হয় নি।

পাতা-খসার শব্দ। দূরে ঝাউবনে কারো দীর্ঘ নিঃশ্বাসের
মতো কিছু অনুদ্দেশ্য হাওয়ায় ডুবে যায়।
চুপচাপ বারান্দায় নক্ষত্রেরাই ভিড় করবে
কোনো এক সময় একে-একে। তাই যেন।

এই সময় আমার কিছু কথা বলার ইচ্ছে মনে
জেগে ওঠে। মুখোমুখি। পুকুরের জলে ছিনিমিনি তোলার মতো
সন্তর্পণে একখানি টলটলে আবরণ, অর্থ।

সময়। উপস্থিতি-অনুপস্থিতি, আবর্তনে-অনাবর্তনে।

সময়। পদক্ষেপ। বাঁচার মেদ-মজ্জা। উপানুপস্থিতির
চৌকাট পেরিয়ে কোনো-কোনো শব্দ ভূমিষ্ঠ হয়
ধ্বনির অনিশ্চিত মননে। শূন্যে।

সময়। সহোদর শূন্য।

শ্বসন। অতিরৌদ্র স্বরে, অতিস্বনান্ধকারে।

একুশে ফেব্রুয়ারি

সৈয়দ সমিতুল আলম

দৃষ্টিতে জড়িয়ে রাখো জননীর ভাষা
নাভিমূলে জ্বলে তার আধেক সোপান
মাদলে বাদল স্থর অজেয় পিপাসা
বুকে রাখো সায়স্তন দৃশ্য সমাধান

অদৃশ্য স্বপ্নের শুরু এই হতে পর
নরলোকে মুগ্ধতায় অলক্ষ্য গাণ্ডীবে
অব্যর্থ দৃষ্টির তীর বিদ্ধ অতঃপর
শাণিত কৃপাণে সে-ই ছায়া, কায়া দিবে

দৃষ্টিতে নিবদ্ধ থাকে মাটির প্রত্যাশা
শূন্য তল ছুঁয়ে যায় দৃষ্টির পুরাণ
অবয়বে মোক্ষ লাভ জননী ভাষার
বন্ধন ঘুচিলে প্রিয় মুক্তি অবিরাম

আর্য-অনার্যের এই মাটি মূল প্রাণে
কতকাল জুড়ে বয় তাড়কা-উল্লাস
দৃষ্টি জ্বালায় আগুন ব্যর্থ, আত্ম-ভনে
যদি হয় হোক ক্ষতি আমার অবিশ্বাস

আগুনেই জন্ম হবে সুদীর্ঘ সোপান
নাভিমূলে ওংকার জলজ মুদ্রায়
স্ফুরিত ভাষার কায়া জননীর প্রাণ
মূলত মানব-ই রেণু বুকে নিতে চায়।

দক্ষিণায়নে সূর্য

সুজিৎ ঘোষ

গোলাপবাগান খুঁজে পেতে চেয়েছিল এক কবি
যোগেশ কেঁদেছে স্টেজে যেদিন শুকাল তার সাজানো বাগান

কেউ গাছ পুঁতে ছিল
কেউ-কেউ ফল খেয়ে গেল
তারও পরে কিছু লোক মূল তুলে ডালপালা
সব কিছু আগুনে জ্বালাল

এখন শীতের ঋতু
পাইন ফারের বন উত্তরের সব পাতা-ঝরা
শরীর আতপ্ত রাখতে
চাহিদায় নারী ও মদিরা
শীতল স্বর্ণের
অথবা ইগলু
উত্তাপের জন্যে কারা গড়ে তোলে।
অথবা সে জতুগৃহ আত্মহননেরই আজ হেতু?

সূর্যের উত্তাপ থেকে কবে আর বিভূতি ঝরেছে?
এ গোলার্ধে তাকালেই
দক্ষিণায়নে সূর্য
রোদ আসে আমার এ ঘরে
মানুষেরই দেহ থেকে জন্ম পায়
ঘাম রক্ত, কখনও মানুষ
কিছু ভালো, কিছু বাড়াবাড়ি মেশামেশি গলাগলি হয়ে
বড়ো একা লাগে? শীত? চলে এসো সোজা
ডান-বাম না তাকিয়ে আমাদের ঘরে
এখানে ঋতুর চক্র চক্রান্তেও হয় নি ব্যাহত
এখানে পলিতকেশ বৃদ্ধ আছি, শিশু আছে
আছে উষ্ণ নারী
বাগানের গাছে-গাছে পাতা আজও সমস্ত ঝরে নি
কিছু পাখি, কিছু ফুল—এই সবই কমবেশি বিকশিত হয়

যারা চলে গেছ
উষ্ণতায় ডাক দেব: পুনর্দর্শনায় চ।

আমারই চেতনার রঙে

তাপস সেন

আমরা কত কিছুই দেখি, কত কিছুই শুনি। এই দেখাশোনা ছাড়াও কয়েকটি অনুভূতি আমাদের আছে। যেমন, ঘ্রাণ-স্পর্শ-স্বাদ। আমাদের দেখা-শোনাটা নিয়ে সচরাচর আমরা খুশিই থাকি, যদিও খুশি থাকা বোধহয় উচিত নয়। এই যে এখন লিখছি—ঘরের ভেতর ঘরের বাইরে কত শব্দ কত আওয়াজ, অথচ সেসব ঠিক শ্রুতিগোচর হচ্ছে না। কেননা, অনেকগুলো ত্রুটি নিয়ে তৈরি আমাদের এই সচেতনতা। আমরা ভুলে যাই; যদি না-যেতাম কত গাদা-গাদা স্মৃতি ধাক্কাধাক্কি করত মনের মধ্যে। আমার বাবা আমার মা তাঁদের মা-বাবা—এদের সকলের মৃত্যু, যত রকম দুঃখ-শোক সব মিলে মনটার মধ্যে কী দুঃসহ একটা চাপ সৃষ্টি করে রাখত। এটা ত্রুটিই তো। আবার, এক অর্থে গুণও বটে। ত্রুটি বা গুণ যাই হোক না কেন, এটা আছে। আছে বলেই যতটা দরকার মনে রাখতে পারি, বাকিটা ভুলে যাই। কিন্তু, সত্যিই কি সব ভুলি? কখনো-কখনো যে যা ভুলে গেছি বলে মনে হয় তাও স্মৃতির অতল থেকে ভেসে উঠে আসে দেখি। কান দিয়ে যা ঢোকে মন দিয়ে তার কিছুটা শুনি। তেমনি চোখে যা পড়ে তার কিছু-কিছু দেখি মনের আয়নায়। বলি, চলচ্চিত্র। কিন্তু, যা দেখি তা চলন্ত চিত্র নয়, স্থিরচিত্র। একটা ছবি—তারপর কিছুক্ষণ অন্ধকার। তারপর আসে পরের ছবিটা। ছবিতে দেখি একজন তার হাতটা তুলছে। হাতটা একটু তুলল, তারপর কিছুক্ষণ অন্ধকার, তারপর হাতটা আরেকটু তুলল। সব স্থিরচিত্র—একের পর এক। এই স্থিরচিত্রগুলো যখন পরপর দেখি তখন মাঝখানের ওই অন্ধকার ওই বিভাজনগুলো দেখতে পাই না—টের পাই না। এটা একটা ত্রুটি। পারসিসটেন্স্ অব্ ভিসন্—দৃশ্যকে আঁকড়ে থাকা। ওই যে, হাতটা যখন নিচে আছে, ওই অবস্থানটার সঙ্গে পরের ফ্রেমে আরেকটু ওপরে উঠে-যাওয়া হাতের অবস্থানটা মনের মধ্যে যোগ করি। এইভাবে ফ্রেমের পরে ফ্রেম—এক সেকেণ্ডের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ সময়ে একটা করে ফ্রেম—দেখি আর মনে-মনে গেঁথে যাই। আর, হাতটা নিচ থেকে ওপরে উঠে আসে 'নিমেষে'। একটা পাখি উড়ে গেল। কী দেখব? পাখিটা দাঁড়ে বসে আছে, তারপর একটু দূরে, তারপর আরেকটু। তিনটে চারটে পঞ্চাশটা অবস্থান, মাঝে অনেকগুলো ফাঁক—অন্ধকারের ফাঁক। আমাদের মন এই ফাঁকিটা তৈরি করে, ধরতে দেয় না ফাঁকগুলো। টেলিভিশনের পরদায় অনেকগুলো ডট্ দিয়ে ছবি তৈরি হয়ে ওঠে—অনেক ডট্স্। আমাদের ওই আঁকড়ে-থাকার প্রবণতার দরুন ছবি-নড়াচড়াটা চলতে থাকে।

শোনার ব্যাপারেও তেমনি। আমরা যা শুনতে চাই তাই শুনি। এই যে এই মুহূর্তে ঘরের বাইরে এত পাখি ডাকছে সেটা ঠিকঠিক কানে আসছে না। আসলে আমাদের দেখাশোনাটা চলে বাছাই করে। চোখ বাছে, কান বাছে। রাতে দূরের ট্রেনের আওয়াজ পাওয়া যায়, দিনের বেলায় অন্য আরও নানা শব্দের সঙ্গে তা মিশে থাকে। রাতের নিস্তব্ধতায় ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যায়। সাইলেন্সটা যে কী তা বুঝতে পারি। একটা পিচে শব্দের কম্পন আমাদের কানে কাজ করে, অন্যগুলোকে বাতিল করে দিই। এখন যদি খুব জোরে ডেকে ওঠে একটা কাক তা শুনতে পাব, কিন্তু আমি লিখছি আর সারাক্ষণ যে কাক ডেকে চলেছে সেটা খেয়াল করছি না। টেপ করে যদি বাজানো হয় মনে হবে চিড়িয়াখানায় পাখির খাঁচার মধ্যে যেন বসে আছি কিংবা যেন হিচককের "বার্ডস" ছবিটার কোনো সিচুয়েশন। আর, একথাটা ভাবতে গিয়েই মনে পড়ে গেল আমাদের চোদ্দপুরুষের গল্প—মানুষের অ্যানসেস্ট্রাল স্টোরি। প্রাণের সূত্রপাতটা সমুদ্রের তলায়। সেই সেল্ থেকে ধাপে-ধাপে জলজ প্রোটো-জোয়া হল, তারপর হল অ্যামিবা। তারপর প্লান্ট লাইফ এল—শ্যাওলা। তারপর জলচর হল। জল থেকে ডাঙায় গেল, আবার ডাঙা থেকে জলে এল—হল উভচর। উড়তে চেষ্টা করল। এমনি করে অনেক বিবর্তনের পর "মানুষ" নামে একটা জন্তু হল, যারা দুপায়ে দাঁড়াতে পারে। হাত দুটো—অর্থাৎ, সামনে যে দুটো পা ছিল তার চারিত্র্য বহু লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বদলাতে-বদলাতে হাত হল। কোনো একটা সময়ে হল। কিন্তু, 'সামনে পা' মানে কী। মুণ্ডুটা সবচেয়ে জরুরি—সবচেয়ে জটিল। ওটাই হেড-কোয়ার্টার। চোখ দুটোও সেখানেই। তাই, সেই মাথার কাছাকাছি যেটা সেটা হল সামনে। সামনে আর পেছনের ধারণাটা এই থেকেই। যাই হোক, ওদুটো আর পা রইল না, হাত হয়ে গেল। তার প্রত্যন্তে যে প্রত্যঙ্গ তাকে বলি আঙুল। এই আঙুলে একটা বিচিত্র বদল ঘটল। সমস্ত জীবজন্তুর পায়ের আঙুল সমান্তরাল। আমাদের হাতেরও চারটে আঙুল সমান্তরাল, কিন্তু বুড়ো আঙুলটা অন্যরকম—সেটা অপোজেব্ল্। এই অপোজেব্ল্ থাম্ব্ দিয়ে যে কোনো একটা জিনিস ধরা যায়—আঁকড়ানো যায়। আমাদের পিতৃপুরুষ সেইসব আরবোরিয়াল প্রাইমেট্স্—তারা ডাল ধরে একগাছ থেকে অন্য গাছে বিচরণ করতে কিংবা আত্মরক্ষার জন্য পাথর তুলে ছুঁড়ে মারতে পারত এরই সাহায্যে। আর, দু পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারার ফলে তার দেখার ধরন—পয়েনট অব ভিউটাই গেল বদলে। এই ব্যালান্স করে দাঁড়ানোটা যে কী তাজ্জব ব্যাপার আমরা তা ভেবে দেখি না। সাইকেল চালানো—সেটাও কী তাজ্জব! আমরা ভাবি না—অভ্যস্ত হয়ে যাই। একটা মড়াকে দাঁড় করিয়ে দিলে সেটা দাঁড়িয়ে থাকে না পড়ে যায়। কিন্তু, মানুষ পারে। কত শক্ত কাজ। ব্রেইন্ থেকে কতগুলো নির্দেশ কতগুলো মাংসপেশীর কতরকম সঙ্কোচন-প্রসারণ আর সমন্বয়ের পরিণামে সম্ভব হয় এই সোজা হয়ে দাঁড়ানোটা। আর, তার ফলে আবার—অর্থাৎ এই দাঁড়াতে পারার ফলে বদলে যায় পয়েনট অব ভিউ। আমাদের সেই পূর্বপুরুষ পেরেছিল সামনের দিকে

অনেকখানি জুড়ে মেলে দিতে তার দৃষ্টিকে, দেখেছিল আকাশে সূর্য-চন্দ্র-মেঘ। অবাক হয়েছিল। প্রশ্ন জেগেছিল মনে একের পর এক। ভাবতে শুরু করেছিল। আর, হয়ে উঠেছিল হোমো-স্যাপিয়েনস।

কিন্তু, আরেক রকম "দেখা" আছে। আমাদের সকলেরই। জীবনে কত কিছু ঘটে, কত কিছু দেখি-শুনি-ভাবি, হয়তো সচেতনভাবে ভাবি নি, হয়তো হয় নি—হবেও না কোনোদিন—এমনই কত কিছু নিয়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি আমরা। স্বপ্নগুলো কী? ফ্রয়েড এবং অন্যরাও বলেছেন এগুলো আমাদের অবচেতনে কিলবিল করতে-থাকা কতকগুলো দমিত ভাবনা-চিন্তার একরকম 'প্রকাশ'। আবার অন্যেরা বলেন, এগুলো হল আমাদের নিউরোন-এর সেল থেকে সেল-এর ধাক্কাধাক্কি-থোঁচাথুঁচির মধ্য দিয়ে কতক-গুলো 'বহিঃপ্রকাশ'। স্বপ্ন ভিস্যুয়াল, স্বপ্ন ট্যাক্‌টাইল। স্বপ্নে ছবি আসে, রঙ আসে, চেহারা দেখি, অনুভব করি স্পর্শ। কথা শুনতে পাই। নিজের ভাষায় স্বপ্ন দেখি বা শিখে-নেওয়া ভাষাতেও। স্বপ্ন যেন একটা অদ্ভুত জগৎ। আধুনিকতম চিত্রশিল্প বা কবিতা থেকেও রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয়, ঋাপসা। কিন্তু, প্রায় প্রত্যেকরাতে সেটা আমাদের নাড়া দিয়ে যায়। টের পাই কখন? তখন ওই একটা সন্ধিক্ষণ—অন্ধকার থেকে আলোতে বা আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়া-আসার সময়—অর্থাৎ, আমাদের ঘুমটা যখন পাতলা হয়ে আসে, তখন এই চিন্তাগুলো আমাদের ক্রমজাগ্রত চেতনার মধ্যে খানিকটা ঢুকে পড়ে। এই যে এখন জেগে আছি—লিখছি, এখনও ওই স্তরটায় কাজ চলছে। চেতনার এমন একটা স্তরে যেখানে আমারই ভাবনায় আমার অবাধ প্রবেশ নেই। 'ভাবছিই না' বলা যেতে পারে। যেমন, হাঁটবার বা সাইকেল চালানোর সময় আমার অজানতেই আমার শরীরের মধ্যে ঘটে চলে কত অসংখ্য প্রক্রিয়া। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন প্রতিমুহূর্তে গুনে-গুনে নিতে বা ছাড়তে হয় না। যে টাইপ করে সে যেমন xyzABC কোথায় আছে ভেবে-ভেবে টাইপ করে না। তেমনি আমার সাইক্-এর মধ্যে ওই স্তরের কাজটা চলতে থাকে। কেবল যখন অন্যান্য চিন্তাচিন্তাগুলো চেতনার মধ্যে সুপ্ত হয়ে পড়ে তখনই ওই অন্যস্তরস্থ ভাবনাগুলো ভুস করে ভেসে ওঠে। "বালক" পত্রিকার জন্য একটা লেখা তৈরি করতে হবে রবীন্দ্রনাথকে, কিন্তু কোনো প্লট ভেবে পাচ্ছেন না। রেলগাড়িতে যাচ্ছিলেন, উজ্জ্বল-আলো কামরায়, ঘুম আসছিল না। প্লট ভাবতে-ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্ন দেখলেন, একটা মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে আর তাই দেখে একটি বাচ্চা মেয়ে তার বাবাকে বলছে 'বাবা, এত রক্ত কেন?' ব্যস, পেয়ে গেলেন বীজ "রাজর্ষি"র। তেমনি, কেকুল নামে একজন বিজ্ঞানী অনেকদিন ধরে খুঁজছিলেন বেনজিনের ফরমুলা, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। একদিন স্বপ্নে দেখলেন একটা সাপ নিজের লেজটা খাচ্ছে—বৃত্তাকার একটা ছবি, একটা সারকুল্। ব্যস। ঘুম ভেঙে উঠে লিখলেন সাইকুল্ অব বেনজিন। অটো লুই বলে আরেকজন বের করতে চেষ্টা করছিলেন আমাদের ব্রেইনে যে ট্রানসমিশন হয়—যে ওয়েভ তার চরিত্রটা কী। তা কি ইলেক্‌ট্রিকাল না কেমিকাল? স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু পারলেন না লিখতে। পরের রাতে আবার দেখলেন স্বপ্ন। লিখলেন, সেটা কেমিকাল। এগুলো কী করে হয় আমরা তা সঠিক জানি না। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে একজন একটা খুব সুন্দর তুলনা করেছেন। আকাশে তারা আছে, কিন্তু আমরা সবসময় তা দেখতে পাই না। রাতে দেখতে পাই। তারা, তারাপুঞ্জ, গ্যালাক্‌সি—নেবুলা মিলকিওয়ে কত দূর-দুরান্ত পর্যন্ত দেখতে পাই রাতে—অন্ধকার হলে। পৃথিবী পাক খেয়ে সূর্যের দিকে পেছন ফিরলে তবে। অন্ধকারের এই একটা গুণ। আমাদের বায়ুমণ্ডলে সূর্যের আলো সব বড্ডো ছড়িয়ে রাখে—ঝলসে দেয় চারিদিক। কিন্তু, দিনের বেলাতেই গভীর কোনো কুয়ো বা টানেলের মধ্য দিয়ে যদি আকাশের দিকে তাকানো যায় তবে,

অনেক সময়, তারা—কিছু-কিছু তারা—দেখা যায়। তখন বুঝতে পারি, দিনের আকাশেও তারা আছে—থাকে। স্বপ্নও তেমনি প্রতি মুহূর্তে আছে—থাকে। আমার এই জাগ্রত মুহূর্তেও আছে, কিন্তু আমি দেখতে পাই না। পাব টানেলের শেষ প্রান্তে গেলে। চেতনার টোয়াইলাইট জোনে স্বপ্নগুলো সঞ্চরণশীল। জে. ডব্লু. ডুন বলেছিলেন, 'Dreams are perpendicular extension of time'। এই টাইম আর স্পেস নিয়ে উথালপাতাল চলছে এখন। এক সময় জানা ছিল আলো সরলরেখায় চলে। রাইমেন্‌স্ কার্ভেচারের কথা বলেছিলেন একজন অঙ্কবিদ। তার ওপর ভিত্তি করে আইনস্টাইন জানালেন স্পেসের কার্ভেচার আর টাইম-স্পেসের পারস্পরিকতার কথা, জানালেন আলোও বাঁকে। বৃহস্পতির উপগ্রহকে লক্ষ করতে গিয়ে জানা গেল সূর্যের প্রচণ্ড ভরের টানে সংলগ্ন স্পেসটাই বেঁকে যায়। আলো কেন বেঁকে এল এই প্রশ্নটায় হোঁচট খেয়েই উদ্‌ঘাটিত হল নতুন সত্য। আমাদের এতাবৎ কালের জ্যামিতির ধারণা—বাস্তবের ধারণা সব এলোমেলো করে দিল এইসব নতুন জ্ঞান। সব যুগেই এমন করে হোঁচট-খাওয়া থেকে পাওয়া গেছে উত্তর। আর, বিস্তৃততর হয়েছে আমাদের চেতনার জগৎ।

আমাদের স্বপ্নগুলো তাহলে ওই দিনের আকাশের তারার মতন। এতে আরেকটা কথা এসে পড়ছে। প্রায় দেড় শ বছর আগে একজন মানুষ প্রশ্ন তুলেছিলেন—রাতের আকাশ অন্ধকার হবে কেন! বলেছিলেন, আকাশ তো অন্ধকার হওয়া উচিত নয়। তাঁর নাম হাইনরিখ ওলবার। সবাই হেসেছিল তখন। এরই নাম ওলবার্‌স্ প্যারাডক্‌স্। এই সম্প্রতি জানা গেল ওলবার সাহেব মিথ্যে বলেন নি। আকাশ কোনো সময়েই অন্ধকার নয়। আকাশে আমাদের এই সূর্যের চাইতে হাজারগুণ লক্ষগুণ বেশি আলোকময় তারা আছে। টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা যায় কত তারা, কিন্তু এত দূরে যে টিমটিম করে। যে যত দূরে তার আলো তত কম বলে মনে হবে। আমরা জানি, আলোর গতি এক সেকেনডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এই বিপুল গতিতে চলেও এত কাছের যে সূর্য তার আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় সাড়ে আট মিনিট পর। আমাদের সবচেয়ে কাছে অ্যান্ড্রোমিডা, আরো কত গ্রহনক্ষত্র আছে। সূর্য তো নগণ্য-পুঁচকে—এই স্পাইরাল গ্যালাক্‌সিটার এক প্রান্তে—এক কোনায় পড়ে আছে। একটা মাঝারি দরের তারা মাত্র। এর থেকে লক্ষ গুণ বড়ো তারা আছে। সূর্যের চারদিকে পুঁচকে-পুঁচকে কয়েকটা গ্রহ ঘুরছে। প্লুটোর পরে এই সৌরজগতের সীমার মধ্যে আর কিছু নেই। কেবলমাত্র মহাজাগতিক "শীতল-নীরবতা"। তার পরে আরেকটা গ্যালাক্‌সি, তারপর আরেকটা। আর, এই সমস্তটা সমস্ত দিক থেকে ছুটে চলেছে মহাবিক্রমে—বিপুল বেগে। আমাদের পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সেই সঙ্গে ঘুরছে নিজের অক্ষরেখায়। সূর্য আর তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে যে সৌর পরিবার সেটাও ঘুরছে। আমাদের এই স্পাইরাল গ্যালাক্‌সিটাও ঘুরছে মস্ত এক 'ক্যাথারিন্‌হুইল্'-এর মতো নিজের কেন্দ্রের চারপাশে। আর, নক্ষত্র-পুঞ্জগুলো একটা অন্যটার কাছ থেকে কেবলই ছুটে পালাচ্ছে। কতদূরে কী গতিতে পালাচ্ছে তা মাপা হয় রঙ দিয়ে। আলোর কম্পন—ওয়েভ লেংথ-এর একেকটার একেক রঙ। সবচেয়ে বেশি ঠেলে যেটা আমরা তাকে বলি লাল, বলি 'লাল মানে বেশ গরম, সাঙ্ঘাতিক'। আর, সবচেয়ে ঠাণ্ডাটা হল নীল। কিন্তু, আসলে নীল বা বেগুনে রঙের ওয়েভ লেংথ সবচেয়ে কম, কম্পনাঙ্ক সবচেয়ে বেশি। আর, লাল হল দীর্ঘ তরঙ্গ—কম্পনাঙ্ক অনেক কম। এই দূর-দুরান্তের আলোর চরিত্র হল এই যে তা টুকরো-টুকরো, ফলে আলোর ব্যানড তৈরি হয়। সেই ব্যানডে লালের দিকে যত যায় তাকে বলে 'রেড শিফ্‌ট্', আর নীলের দিকে হলে 'ব্লু শিফ্‌ট্'। এই লাল-নীলের খেলাটা আমাদের মঞ্চের রঙের খেলা নয়।

তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে কথাটাই ক্রমশ বুঝছি আমি।

ওলবারের প্যারাডক্স্ তাহলে যথার্থ বলে প্রমাণিত হল। বোঝা গেল লোকটা পাগল ছিল না। হোব্‌ল্ প্রতিপন্ন করলেন প্রসারমাণ মহাজগতের তত্ত্ব—দেখালেন সবাই সবার কাছ থেকে পালাচ্ছে। অবিশ্বাস্য আলোকবর্ষ দূরে সরে যাচ্ছে। এতই দূরে যে তার আর কোনো মাপজোখ নেই। লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। এটা আলোকবর্ষ দিয়ে আর মাপা সম্ভব নয়। ইনচি-গজ দিয়ে শার্ট-প্যানটের মাপ নেওয়া হয়, কিন্তু এখান থেকে ব্যাঙ্গালোর বা বম্বের দূরত্ব মাপা সম্ভব নয়। প্রয়োজন অন্য মাপকাঠি। তেমনি। তখন, জ্যোতির্বিজ্ঞানে এল আরেকটি একক —'পারসেক্'। এক পারসেক্ হল ৩·২৬ আলোক-বর্ষ। দেখা গেল তাতেও কূলকিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। তখন, মেগা-পারসেক্ হল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কূল-কিনারা মিলল না তাতেও। নক্ষত্রপুঞ্জের এই দূরে সরে-যাওয়াটা বোঝানোর উদাহরণটা এই রকম। একটা না-ফুলোনো ছোট্টো বেলুন, তার গায়ে পরস্পর সংলগ্ন অনেকগুলো ফুটকি। বেলুনটা ফোলালে দেখা যাবে, বেলুন যত বড়ো হচ্ছে ওই সংলগ্ন ফুটকিগুলো ততই পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের মধ্যবর্তী স্পেসটা বাড়ছে। তেমনি, আমাদের ওই স্পেস—একসময় যাকে ভাবা হত 'কিচ্ছু না' বলে, বলা হত 'ইথার্'—সেই স্পেসটা ক্রমশ বাড়ছে। প্রসারমাণ মহাবিশ্ব আর প্রসারমাণ আয়তন বেড়েই চলেছে, যত দূরে যাচ্ছে ততই। এত লক্ষ-লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে যে তাদের আলো এখনো এখানে এসে পৌঁছতেই পারে নি। তাই রাতের আকাশ অন্ধকার। ওইসব নক্ষত্রপুঞ্জের সবটা আলো একসঙ্গে মিললে তা হত জ্বলন্ত সাদা। তাহলে কি হত? সৌর ব্যবস্থাটা হত না। পৃথিবী হত না। প্রাণ হত না। আমরা থাকতাম না। দেখতে পেতাম না এত তারা আছে। সবটা মিলে একটা ঝলসানো অগ্নিকুণ্ড। ওই ওলবার্স্ প্যারাডক্স্ থেকেই সমাধান মিলল কেন অন্ধকার হয়, কেন অন্ধকার এত জরুরি আমাদের জন্য। আমাদের চেতনার আলোতে অন্ধকারকে চেনা গেল।

প্রাণের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে এই গ্রহে। গবেষণা চলছে আর কোথাও হয়েছে কিনা তাই নিয়ে—সার্চ ফর্ একস্ট্রাটেরেস্ট্রিয়াল ইন্‌টেলি-জেন্স। কিন্তু, সে আছে কি নেই এখনো জানি না আমরা। 'পাঁচ ভাবনা' নিয়ে আছি আমরা: চোখের দেখা, কানের শোনা, জিভের স্বাদ, নাকের গন্ধ আর ত্বকের স্পর্শ। আমাদের চেনাজানা জগতের মধ্যে এই সচেতনতাই বা আবার কতরকম। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যবস্থা মনুষ্যেতর প্রাণীদের চাইতে অনেক নিকৃষ্ট। আমরা চোখে যতরকম বৈচিত্র্য ধরতে পারি, অনেক জীবজন্তু আবার তা পারে না। পুরুষ ভাইপার সাপ লাল দেখে, আর স্ত্রী ভাইপার দেখে হলুদ—আর কোনো রঙ দেখতে পায় না। ষাঁড় দেখতে পায় শুধু ধূসর রঙ। মাটাডরের লাল কম্বলের লালটা সে দেখতে পায় না মোটেই। সাপের কান নেই। সাপুড়ের বাঁশির সুর সে শুনতে পায় না, শুধু দেখে বাঁশিটা নড়ছে। আমাদের ভাবনা তো এই সেন্স দিয়েই। কড়কড় করে বাজ পড়ল একটা বা নায়েগ্রা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ সবটাই মাঠে মারা যায় যদি কেউ সেখানে না থাকে। শব্দ যদি কারোর কর্ণপটাহে কম্পন না তোলে ব্রেইনে কোনো তরঙ্গ উঠবে না। এইসব তরঙ্গের কতরকম অনুবাদ হয়। চোখে-দেখা আলোটা, কানে-শোনা শব্দটা, জিভের স্বাদটা, গরম-ঠাণ্ডার অনুভব—সবই হচ্ছে ব্রেইনের মধ্যে কতকগুলি ইলেক্‌ট্রো-কেমিকাল ইম্‌পাল্‌স্-এর যোগবিয়োগ। কী করে দেখি? সোজা বার্ দেখি, ব্রেইনে কতকগুলি সেল্-এ তা পৌঁছয়। হুবেল্ আর ওয়াইজাল্ নোব্‌ল্ পুরস্কার পেয়েছেন এই কয়েক বছর আগে। জ্যান্ত বেড়ালের মগজে মাইক্রো-ইলেক্‌ট্রোড ঢুকিয়ে দেখা গেছে যখন

অনুলম্ব বার্ দেখানো হয় তখন ব্রেইনের একটা জায়গায় কতকগুলো কন্‌ফিগারেশন জ্বলে ওঠে। আবার যখন অনুভূমিক দেখানো হয় তখন অন্য জায়গায়, তির্যক দেখানো হলে আবার অন্য এক জায়গায় কন্‌ফিগারেশন হয়। লক্ষ-লক্ষ নিউরোন-এর মধ্যে ছক রয়েছে কীরকম করে দেখব। তারা ঝিলিক মারে, উলটে-পালটে একটা গড়ন হয় আর আমরা দেখি-শুনি-গন্ধ পাই-স্বাদ পাই-স্পর্শ অনুভব করি। এই নিয়ে ঠাট্টাও করেছেন কেউ-কেউ, বলেছেন—এ হলো গ্র্যানডমাদার্স সেল থিওরি। এই সন্দেহ, সংশয়, এইরকম প্রশ্ন থেকেই মানুষ পেয়েছে উত্তর খুঁজে বের করার তাগিদ। সত্যকে জেনেবুঝে নেবার প্রেরণা। সেই দু পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর দিন থেকে আজ পর্যন্ত সত্যের দিকে এগিয়ে চলাটা অব্যাহত রয়েছে এইভাবেই।

কূলকিনারাহীন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব তো কিছুই না। একেবারেই 'কিচ্ছু না' মাত্র। তবু, এই কথাগুলো আমরা ভাবতে পারছি। অসহায়, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব মানুষ এসব ভাবতে পারছে। ভাবতে পারছে বলেই তারই চেতনার রঙে চুনি লাল হয়ে উঠেছে, পান্না হয়েছে সবুজ। আর তাই, পঞ্চাশ বছর ধরে মঞ্চের ওপর আলো-অন্ধকার-রঙ নিয়ে খেলা করতে-থাকা আমিও আজ এই মহাবিশ্বমঞ্চের রঙ-আলো-অন্ধকারের রহস্যময়তার দোরগোড়ায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছি এক অবোধ শিশুর মুগ্ধ-বিস্ময় নিয়ে।

অসামান্যপ্রতিভাধর আলোকশিল্পী তাপস সেনের জন্ম ১৯২৪ সালের ১১ই সেপটেম্বর, আসামের ধুবড়িতে। পড়াশুনা করেন দিল্লিতে। থিয়েটারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন অতি অল্প বয়স থেকেই। ১৯৪৬-এ কাজ করেন বোম্বাইয়ে যশস্বী ক্যামেরাম্যান দিলীপ গুপ্তের সঙ্গে। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় এসে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর কাজে যোগ দেন। মঞ্চে লাইট ডিরেকটার বা আলোকনির্দেশক হিসাবে কাজ করেছেন শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, জ্ঞানেশ মুখার্জী, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্যামানন্দ জালান প্রমুখ খ্যাতিমান পরিচালকদের সঙ্গে। নৃত্যের জগতে সাধনা বোস, বালকৃষ্ণ মেনন, বালা সরস্বতী, বৈজয়ন্তীমালা, মৃণালিনী সারাভাই, বিরজু মহারাজের মতো বহু নামী নৃত্যশিল্পীর আলোকনির্দেশনার কাজ করেছেন তাপস সেন। রবিশঙ্কর, ভি. বালসারা, ভাস্কর চন্দ্রভাস্করের মতো সঙ্গীতশিল্পীর আলোর কাজের সঙ্গেও জড়িত তাঁর নাম। তিনি সঙ্গীত-নাটক অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৯৭৪ সালে এবং নান্দীকার অ্যাম্বুয়াল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ১৯৮৭ সালে। তাপস সেন ইনডিয়ান সোসাইটি অব ইনজিনিয়ার্স-এর ফেলো। আলোকশিল্পী হিসাবে তাপস সেন এখন একটি আন্তর্জাতিক নাম। আমাদের দেশে মঞ্চশিল্পের জগতে তিনি আজ একটি প্রতিষ্ঠানসদৃশ ব্যক্তিত্ব। উৎপল দত্তের ভাষায়, 'তাপসের কাজ বিশ্ব ইতিহাসেও বিরল।' মানুষ হিসাবেও পরিচিত জনদের কাছে তাপস সেন অনেক বড়ো। মৃণাল সেনের ভাষায়, 'তাপস এক নিখাদ মানুষ · যশস্বী খ্যাতিমান তাপস সেন আমার কাছে এবং আরও অনেকের কাছেই এক বিরল মানুষ।'

১৩৫০-এর মন্বন্তর, বিক্রমপুর, ঢাকা

অশোক মিত্র

ক্রিপস মিশনের পর সেক্রেটারি অভ স্টেট এমেরি, বড়লাট লিনলিথগো, বাঙলার লাট হার্বার্টের প্রতি আমার বিরূপতা বাড়ে। তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগও হয়। আমার কেমন ধারণা হয় তিনজনেই যেমন ধূর্ত, তেমন শঠ। ভারতের উপর এক হাত নিতে বদ্ধপরিকর। হার্বার্ট সম্বন্ধে আমার বিতৃষ্ণা শুরু হয় উনি যখন কৃষ্ণনগরে ১৯৪১ সালে দু-একদিনের জন্যে সফরে আসেন, স্ত্রীকে সঙ্গে করে। হর্তা-কর্তা-বিধাতা ভাব। এ ধারণা আমার অকারণ বিরূপতা বলে মন থেকে দূর করার অনেক চেষ্টা করেছি। তবে, ১৯৪২-এর গোড়া থেকে যেসব ঘটনা শুরু হল তাতে মনে হল হয়তো খুব ভুল করি নি। ১৯৮৮ সালে এমেরির ১৯২৯-৪৬ যুগের ব্যক্তিগত ডায়ারি প্রকাশিত হয়। সেটি পড়ে মনে হয়, ১৯৪০-এর অগস্ট মাসে যখন আই-সি-এস চাকরির সনদ সই করতে আমি তাঁর কাছে যাই ইনডিয়া অফিসে, তখন তাঁর চোখে যে সুদূর, শূন্য দৃষ্টি দেখেছিলুম তা হয়তো আমারই ভুল। তবে আমি মনে করি "বার্ধক্যের প্রজ্ঞা"র আলোয় যে মতামত হয় তার থেকে পঁচিশ বছর বয়সের মতামতের দাম অনেক বেশি। সেজন্যে আমি তখনকার মতামত অমান্য করতে পারি না।

১৯৪২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি আমি মুন্সীগঞ্জে যাই, পরের দিন এস্-ডি-ও হিসাবে মহকুমার ভার নিই। ১৯৪২-এর ২০শে নভেম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাঙলার মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। পরের বছর ২৯শে মার্চ ফজলুল হকও মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করার পর কিছু-কিছু ব্যাপার পরিষ্কার হল। তবুও বাঙলার আইনসভায় ১৯৪৩-এর ২৯শে ফেব্রুয়ারি শ্যামাপ্রসাদ, আর পরে ২৯শে মার্চ ফজলুল হক পর-পর বিবৃতি না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত পশ্চাৎপটটি খুব স্পষ্ট হয় নি। ফজলুল হক এ-বিষয়ে তাঁর শেষ বিবৃতি দিলেন ১৯৪৩-এর ৫ই জুলাই। তিনটি বিবৃতির উপর বিধানসভায় যেসব আলোচনা আর

বিতর্ক হয় তার থেকে ১৯৪৩-এর মন্বন্তর কিভাবে শুরু হল, কেমন করে ধাপে-ধাপে তা তুঙ্গে উঠল, তার একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য ছবি মনে-মনে তৈরি করতে আমার সুবিধা হয়। সেইসঙ্গে ভারত সাম্রাজ্যের নাইট গ্রানড কমানডার মান্যবর স্যর জন আর্থার হার্বার্টের কুটিলতা সম্বন্ধেও আমার ধারণা আর সন্দেহ দৃঢ় হয়।

এই ছোটো পরিধির মধ্যে ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের কিভাবে অঙ্কুর থেকে পরিণতি ঘটল, তার মোটা-মোটা ঘটনাগুলির উল্লেখ ব্যতীত বেশি কিছু আর বলা সম্ভব নয়। মন্বন্তরের সব-থেকে নির্ভরযোগ্য কালক্রমিক তথ্য আর মন্তব্য, আমার মতে, মিলবে তখনকার কেন্দ্রের এবং প্রদেশের বিধানসভা আর কাউন্সিলের বিতর্কাবলীর নথিপত্র থেকে। আর মিলবে ব্রিটিশ পার্লামেনটের অধিবেশনগুলির নথি থেকে।

আমি প্রচলিত প্রথায় ইতিহাস লিখতে বসি নি। এটি মুখ্যত আত্মকথা। সে সময়ের ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমার তৎকালীন ধ্যানধারণা স্মৃতির থলি থেকে বার করে গেঁথে-গেঁথে বলাই আমার উদ্দেশ্য, তবে সনতারিখ-দেওয়া ঘটনাবলী আর অন্যদের উক্তি থেকে একটি নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাসও নিশ্চয় বেরিয়ে আসবে। আমার নিজের বিশ্বাস, ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতার পর, এশিয়া যুদ্ধের বৃহত্তর কূটনীতি ও সমরনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেন ভারত সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করে, মন্বন্তরের উৎপত্তি ও গতির উপর তার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে, আমার মতে, মন্বন্তরের গতিপ্রকৃতি এবং ফলাফল বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাব্য কারণাবলীর হদিশ ঠিকভাবে মিলবে না; কালক্রমিকতার উপরে জোর না দিলে ঠিক বোঝা যাবে না—প্রবৃত্তিবশেই হোক বা ভেবেচিন্তেই হোক, সরকার এই ধরনের পথ কেন বেছে নিয়েছিলেন। একটা মূল কথা সর্বদা মনে রাখতে হবে। আঠারো আর উনিশ শতকে এবং পরে ১৯৬৬-৬৭ যে বাইশ তেইশ বার করাল দুর্ভিক্ষ হয়, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ছিল তাদের চরিত্রগত তফাত। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ব্রিটেনের এশিয়া যুদ্ধের বৃহত্তর নীতির তৈরি করা অঙ্গ ছিল বলে আমার যে ধারণা হয়, ও এখনও আছে, তার সমর্থনে একটি বড়ো আভ্যন্তরিক যুক্তি সদাই আমার মনে জাগে। সেটি হচ্ছে, অন্য সব দুর্ভিক্ষের উপর যেসব রয়াল কমিশন বসেছিল তার অধিকাংশ রিপোর্টেই দেখি দুর্ভিক্ষের প্রায় প্রতি স্তরে সরকারি মুখপাত্রদের সে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে পৃথক-পৃথক, এমনকী, পরস্পরবিরোধী মতামত, বিশেষত দুর্ভিক্ষ প্রশমন ও নিরাকরণ উদ্দেশ্যে যেসব নীতি সরকার নিয়েছিলেন, তাদের বিষয়ে। কিন্তু ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের বিতর্কগুলিতে দেখি চার্চিল থেকে হার্বার্ট পর্যন্ত সকলেরই এক বয়ান, এক যুক্তি, বাঙলায় যাকে বলে "সব শেয়ালের এক রা"। সর্বস্তরে এত মতৈক্য আগে কখনও ঘটে নি।

কালক্রমিকতার উপর জোর দিয়ে আমি ঘটনাগুলি একের পর এক যেভাবে গেঁথেছি, তা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের উপর যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। অবশ্য পাঠক লক্ষ করবেন, যুদ্ধের বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সঙ্গতি খোঁজার চেষ্টায়, আমি মাঝে-মাঝে আগে-পিছে ঘটনারও উল্লেখ করেছি। অধিকাংশ লেখক দুর্ভিক্ষের বিশেষ-বিশেষ অংশের উপর নিজের মতের উপর জোর দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মুখার্জি বা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মতো পণ্ডিতপ্রবররা মন্বন্তরের অব্যবহিত পরে লিখেছিলেন বলে হয়তো যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ বা গবেষণার সুযোগ পান নি, বিশেষত অধিকাংশ তথ্যই যখন প্রকাশিত হয় নি অথবা সরকার থেকে চেপে রাখা হয়েছিল। অমর্ত্য সেন প্রায় চার দশক পরে লিখলেন; সেই হিসাবে তাঁর বইয়ে আরো তথ্যসমৃদ্ধি দেখলে আমি উপকৃত হতুম। দুর্ভিক্ষের অগ্রগতির সময়ে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় অত যে স্ত্রী আর শিশু মারা গেল, তার কারণ

পরিবারের পুরুষদের তুলনায় তাঁরা যে কম পুষ্টি পেতেন, তা নয়। তার কারণ : ১৯৪২ সালের ১৬ অকটোবর মেদিনীপুর আর ২৪ পরগনা জেলায় যে ভয়ঙ্কর সাইক্লোন হয় তাতে এক রাত্রির প্রথম ছ ঘণ্টার মধ্যেই প্রায় লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। তাদের অধিকাংশই পুরুষ। মৃত পুরুষদের পরিবারের স্ত্রীলোক আর শিশুরাই আশ্রয় আর খাদ্যের অভাবে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়। দিনের পর দিন অনাহারে রোদে-জলে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ভিক্ষার আশায় ঘুরলে সেই ছুঁসহ শ্রমে মৃত্যুর হার দ্রুত বাড়ে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি—কলকাতায় আমাদের পাড়ায় যেসব নারী শিশু কোলে নিয়ে ফ্যান দাও, ফ্যান দাও বলে দরজায়-দরজায় ঘুরতেন, তাঁদের প্রায় সকলেই মেদিনীপুর আর ২৪ পরগনার লোক। খাদ্যদ্রব্যের দাম নির্ধারণ, খাদ্যের সুষ্ঠু বণ্টন, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে দৈনিক আহারের পরিমাণে ও গুণে, পুরুষ ও নারীদের মধ্যে বেশি রকম অসাম্য, তার ফলে নারী ও শিশু-মৃত্যুহারের আধিক্য, এগুলি সবই সেইসব দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে খাটে, যেখানে দু-তিন বছর উপর্যুপরি অনাবৃষ্টি আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে দুর্ভিক্ষ ক্রমে-ক্রমে আসে। এসব কারণের বিশেষ গুরুত্ব থাকে যখন মানুষ আর সরকার দুর্ভিক্ষরোধকল্পে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়, প্রতিরোধের সাধ্যমতো ব্যবস্থা করে। কিন্তু ১৯৪৩ সালে যখন মাত্র তিন মাসেই চালের মণ দশ টাকা থেকে লাফ দিয়ে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট টাকায় উঠল, এবং চাল সরবরাহ সম্বন্ধে সরকার তৎপর না হয়ে একান্ত উদাসীন রইলেন, তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত দুর্ভিক্ষের পুঁথিগত আর্থিক, সমাজতাত্ত্বিক, পরিবারভিত্তিক কারণের কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

ডিনায়াল ও অপসারণ

আমার নিজের সন্দেহ হয়—১৯৪১ সালের ২৭ জানুয়ারি নেতাজীর অন্তর্ধানকে হার্বার্ট নিজের গালে একটি প্রচণ্ড থাপ্পড় হিসাবে নিয়েছিলেন। সরকারের সুচতুর গোয়েন্দা বিভাগের এরকম পরাজয় লিন-লিথগো, এমনকী হোয়াইট হলেরও নিশ্চয় অসহ্য লেগেছিল। আমরা ধারণা, এর পর নতুন কোনো অঘটন যাতে না ঘটে, উপরন্তু যা ঘটেছে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্যে, ব্রিটিশ সরকার বদ্ধপরিকর হলেন। নেতাজী শুধু যে অন্তর্ধান করলেন তাই নয়, তিনি নাৎসিদের এবং পরে জাপানিদের কাছে যে সাহায্য পেলেন তাতে তাঁরা আক্রোশে ক্ষিপ্ত হলেন। এর পর, গান্ধীজী, নেহরু, অন্য নেতারা যখনই বলেছেন তাঁরা নেতাজীর সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখতে চান না, তাঁকে অস্বীকার করেন, এমনকী নেতাজীর আই-এন-এ সংগঠন ও ভারতের জনগণের উদ্দেশে তাঁর বেতার-বাণীর তাঁরা বিরুদ্ধতা করেন, তখনই ব্রিটিশ সরকার সেসব ঘোষণার প্রতি অবিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন। ব্রিটিশ সরকারের এই মনোভাব বোঝা অবশ্য শক্ত নয়। সকলেই যেমন মনে করে শত্রুর শত্রু তার মিত্র, ব্রিটিশ সরকারও নিশ্চয় আমাদের নেতাদের সম্বন্ধে তাই ভাবতেন। ভারতে তাঁদের নিজেদের কার্যকলাপ এত কালিমালিপ্ত ছিল, এবং সে বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের নিজেরই এত অপরাধবোধ ছিল যে ব্রিটিশরা ভাবতেই পারত না ভারতীয়রা তাদের শত্রুদের নিজেদের শত্রু বলে ঘৃণা করবে। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের দম্ভবশে ব্রিটিনের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত ছিল যে জনযুদ্ধের সময় এলে ভারতের আবাল-বৃদ্ধবনিতা প্রতিরোধে যোগ দেবে। ১৯৪০ সালে লনডন ব্লিৎসের পর স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে ব্রিটেনের সকলে প্রতিরোধের জন্যে যেভাবে বদ্ধপরিকর হল তার দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও ব্রিটেনের পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত হল যে ভারতেও সে ধরনের সংকল্প সম্ভব হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের মনস্তত্ত্বানুসারে তাঁরা পেশাদার মাস-মাইনে-করা সেনাবাহিনীর উপরেই বেশি আস্থাশীল থাকলেন। যুদ্ধের চরম সঙ্কট অবস্থাতেও ব্রিটেনের

কাছে ভারতবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্যের কোনো মূল্যই ছিল না, যদিও আমেরিকা আর চীন বিশ্বাস করত যে তাদের যুদ্ধে ভারতবাসীর সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য। সে বিষয়ে ব্রিটেনকে তারা বোঝাতে কসুর করে নি। এমনকী যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নাৎসি আক্রমণে একান্ত বিপর্যস্ত, সে দেশও ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন তা ব্যক্ত করার জন্যে লিতভিনফকে—যিনি রাজদূত হিসাবে আমেরিকায় গেলেন—ভারত হয়ে আমেরিকায় পাঠাল। ব্রিটেনের কাছে এ বিষয়ে চীনের আবেদনের অর্থ না হয় বোঝা যায়, তার কারণ যুদ্ধার্থে চীনের যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ তখন ভারতের মধ্যে দিয়েই হচ্ছিল। কিন্তু ভারতের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোনো কিছু সরবরাহের প্রয়োজন তো হয় নি!

১৯৪১ সালের ১০ ডিসেমবর সিঙ্গাপুর বন্দরে দুটি শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ রণতরীর উপর জাপানি বোমারু আক্রমণের পর ১৯৪২-এর ১৯ জানুয়ারি জাপানিরা বর্মাদেশ আক্রমণ করে। বাঙলার তৎকালীন দুরবস্থা সত্ত্বেও এই প্রদেশে যে ধরনের বেধড়ক দমননীতি চলে, তাতেই হার্বার্টের প্রতিহিংসাবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। সে নীতিতে লিনলিথগো আর এমেরিরও নিশ্চয় সায় ছিল। হার্বার্ট এমন সব কাজে প্রবৃত্ত হলেন যা একমাত্র ক্রোধে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য লোকের পক্ষেই সম্ভব। সে যাই হোক, এখন কালক্রমিক বিবরণ লিখি।

নেতাজীর অন্তর্ধানের আগেই, ১৯৪০ সালে ভারতীয় নেতারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে প্রস্তাব দিলেন, সরকার যদি বিলেতের মতো হোমগার্ড সৃষ্টি করেন, তাঁরা পূর্ণ মদত দেবেন। সে প্রস্তাব সরকার অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। ছেঁদো অজুহাত দিলেন, গ্রামের চৌকিদারদের আর স্থানীয় পুলিশদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সরকারের হাতে নেই। যেন ডানকার্কের পর ইংল্যানডে রাতারাতি সারা দেশময় যে হোমগার্ড গা ঝাড়া দিয়ে উঠল তাদের সকলকে বিশদভাবে রপ্ত করা হয়েছিল। দেশের লোককে সরকার যে আত্মরক্ষায় শিক্ষা দিতে চান নি—এ সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। তবে, পরে ১৯৪১ সালে নেতাজীর অন্তর্ধান আর সেই বছরের শেষে জাপানিদের বর্মা আক্রমণের পরে হার্বার্ট আর লিনলিথগো সরকার যে নীতি মনপ্রাণ দিয়ে অনুসরণ করলেন, তাকে নিতান্ত প্রতিহিংসামূলক, উপরন্তু একান্ত নঞর্থক ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বাঙলা সরকার কথাটি ব্যবহার না করে হার্বার্ট নামটি ব্যবহার করছি তার কারণ আছে : ১৯৩৭-এর আইনানুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে আসীন মন্ত্রিসভা তখন চালু ছিল, কিন্তু এ নীতি ছিল হার্বার্টের নিতান্ত নিজস্ব, মন্ত্রিসভার কোনো সম্পর্ক ছিল না। হার্বার্ট সিদ্ধান্ত নিলেন রাশিয়ানদের পোড়ামাটি নীতি তিনি বাঙলায় পালন করবেন। এই নীতি নিলেন এমন সময়ে যখন সামান্যতম বুদ্ধি ধরে এমন লোকও জানত যে জাপানিদের তখন একান্ত উদ্দেশ্য ছিল বর্মা দখল করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিত্র-শক্তিদের ব্যবহৃত চীনে সরবরাহ পাঠাবার রাস্তাটি যথাসম্বর বন্ধ করে দেওয়া। তার পরে তারা ধীরে-সুস্থে ঠিক করত ভারতে পূর্ব সীমানার ঠিক কোন্ বিন্দুতে আক্রমণ করে সেটি বিধ্বস্ত করে কোন্-কোন্ জায়গা থেকে তারা ভারতের দিকে এগোবে। স্পষ্টই বোঝা গেল, বর্মা আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গে বাঙলা আক্রমণের জন্যে তারা মোটেই ব্যস্ত নয়। তা যদি হত তাহলে সিঙ্গাপুরের মতো, প্রথমেই তারা বাঙলার বন্দর ও তৎসংলগ্ন শহরগুলিতে আকাশ-পথে আক্রমণ শুরু করত।

রাশিয়াতে নাৎসি অগ্রসরের বিরুদ্ধে যে পোড়া-মাটি নীতি অনুসৃত হয়েছিল, তার প্রধান উদ্যোক্তা ছিল স্থানীয় অতিসাধারণ অধিবাসীরা যারা "মেরে মরব" পণ করে নিজের হাতে তাদের সমস্ত কিছু নির্মূলভাবে নষ্ট করে পিছু হঠতে শুরু করে, যাতে

কোনো কিছু উপকারে লাগার মতো সামগ্রী নাৎসিদের হাতে না পড়ে। রাশিয়ানদের এই আত্মদানের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে হার্বার্ট বিশুদ্ধ ধ্বংসলীলায় মেতে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্যই হল শত্রুর বিরুদ্ধে দেশবাসীর প্রতিরোধের ইচ্ছা ও শক্তি—দুই-ই নষ্ট করা। এর ফল হল রক্ষা-কর্তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি। এই ক্ষোভ সব থেকে ফেটে পড়ল মেদিনীপুরে, ১৯৪২-এর অগস্ট আন্দোলনে, যেখানে হার্বার্টের দুটি অস্ত্রই—ধ্বংসাশ্রয়ী পোড়ামাটি আর দেশবাসীর অপসারণ—সবথেকে ভয়াবহভাবে সম্পন্ন করা হল। তার ভৌগোলিক কারণ আছে। চব্বিশ পরগনা জেলা ও পূর্ববঙ্গের সবগুলি সমতট জেলা এত অজস্র দ্বীপ ও খালবিলে ভরা যে সেগুলিতে ধানচাল ও অন্য সম্পত্তি লুকিয়ে রাখা এবং প্রাণ নিয়ে পালানো তবু কিছুটা সম্ভব। কিন্তু মেদিনীপুর সে তুলনায় তিন দিকে শুকনো ডাঙা জমি দিয়ে ঘেরা, তার থেকে পালিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে ডুবে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

ঢাকঢোল পিটিয়ে ডিনায়াল বা পোড়ামাটি আর অপসারণ বা ইভ্যাকুয়েশন—এই জোড়া নীতি ঘোষণা করে এমন নৃশংসভাবে ও সম্পূর্ণভাবে পালন করা হল এবং সংশ্লিষ্ট অত্যাচারের বিন্দুমাত্র খবরও যাতে প্রকাশ না হয় তা এমন নিশ্ছিদ্রভাবে পালিত হল যে, না সংবাদপত্রে, না সরকারি মহাফেজখানায়, সে বিষয়ে কোনো খবর তখন তো প্রকাশ হয়ই নি, আজও কিছুমাত্র পাওয়া যায় না। এমনকী ঠিক কবে এই দুই নীতির কাজ শুরু হল এবং কবে শেষ হল তার সঠিক তারিখগুলি জানারও উপায় নেই। মেদিনীপুর বা আশেপাশের জেলাগুলির কথা বলতে পারি না। কিন্তু ডিনায়াল নীতির ফলে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণের জেলাগুলির যে অবস্থা হল তার ফলাফল আমি ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় স্বচক্ষে দেখলুম। সারা বিক্রমপুরে তখন অন্তত পঁচিশ-ত্রিশটি ধান-চালের বড়ো-বড়ো গঞ্জ ছিল। তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে বাঁধা ছিল একাধিক সাপ্তাহিক হাট যেখানে ধানচালের কেনা-বেচাই হত বেশি। মুন্সীগঞ্জে যখন প্রথম যাই তখন শুনি ১৯৪১ সালের শীতকালেও বিক্রমপুরের গঞ্জে-গঞ্জে কমপক্ষে দশ হাজার থেকে এক লক্ষ বস্তা চাল সর্বদা মজুত থাকত। মিরকাদিম, তালতলা, তারপাশা আর লৌহজঙ্গ ছিল পূর্ববঙ্গের ধানচাল ব্যবসার প্রধান ঘাঁটি। সেই দেশে আমি যখন ৫ই ফেব্রুয়ারি কাজে যোগ দিয়ে কিছুদিন পরে মহকুমার গঞ্জে-গঞ্জে ঘুরলুম, তখন তন্ন-তন্ন করে খোঁজা সত্ত্বেও আমি কোনো আড়তে বড়ো জোর একশ দু-শ বস্তার বেশি চাল দেখি নি।

ডিনায়াল নীতির আবার দুটি অঙ্গ ছিল। যেখানে-যেখানে ধানচাল থাকা সম্ভব—গঞ্জ বা আড়ত, মাঝারি-বড়ো চাষির গোলা বা বড়ো পরিবারের খাবার চালের মরাই হোক—গ্রামে-গ্রামে বাড়ি-বাড়ি পুলিশ হানা দিয়ে যথাসম্ভব ধ্বংস করে দেয় বা বলক্রমে চাল সরকারি দালালের হাতে চালান দেয়। এই বিনাশ সবথেকে বেশি হয় মেদিনীপুর, ২৪-পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি জেলায়। যদি কেউ নষ্ট করার কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করত, তাকে সামান্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ টাকাও দেয়া হত না। যে চাল নষ্ট করা হত বা সরকারের গুদামে চালান করা হত তার কোনো হিসাব কোনো সময়েই পাওয়া যায় নি, সরকারও দেন নি। এই ধরনের ধরা চালের অনেকাংশ ১৯৪৪-এর জুন-জুলাই মাস থেকে ক্রমশ রেশনে ছাড়া হয়। নিতান্ত অযত্নে রাখা চাল অজস্র কাঁকর ও ময়লায় ভর্তি হত, তার উপর ভালো করে রক্ষা না করায় জলে, গুমোটে পচে তাতে গোবরের পচা গন্ধ বেরোত। যাঁরা ১৯৪৪-এর রেশনের চাল খেয়ে এখনও বেঁচে আছেন তাঁরা আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবেন। প্রতি বছর, বোরো, আউশ, আমন—এই তিন ফসল সত্ত্বেও ১৯৪১ সাল

পর্যন্ত বাঙলাদেশে মোট চাহিদার তুলনায় ধানের ফলন অনেক কম হত। যা ঘাটতি হত বর্মা থেকে আমদানি করে সেটি পুরণ হত। মুন্সীগঞ্জে বর্মা চালের নাম ছিল পেগু। দক্ষিণবঙ্গ থেকে মুন্সীগঞ্জে যে চাল আমদানি হত, যে ধরনের নৌকায় আসত তার নামে চালের নাম ছিল বালাম। পেগু চালের আমদানি ১৯৪২-এর এপ্রিল-মে মাস থেকে একে-বারে বন্ধ হয়ে যায়।

ডিনায়াল নীতির আরেকটি অঙ্গ ছিল মেদিনীপুর বা ২৪-পরগনায় যেসব গোরুর গাড়ি ছিল আর পূর্ববঙ্গের দক্ষিণ জেলাগুলি, যেখানে নৌকার চলন ছিল, সেইসব গোরুর গাড়ি ও নৌকা যথাসম্ভব ধ্বংস করা। সেই বিনাশের জন্যে হয় অতি নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেওয়া হত, না হয় আদৌ হত না। ফলে কোটি-কোটি টাকার গোরুর গাড়ি আর নৌকা সারা দক্ষিণবঙ্গময় ধ্বংস করে ধান চাল বা অন্য মাল কাঁচা রাস্তায় বা নদীপথে আনা-নেওয়া একেবারে বন্ধ করা হয়। মধ্য ও উত্তর বঙ্গে ধানচালের আমদানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। ১৯৪২ সালের মার্চ মাস থেকে আমি যতদিন মুন্সীগঞ্জে ছিলুম তখন মেঘনা-পদ্মার বুকে বড়ো বালাম নৌকা খুব কমই দেখেছি। বালাম নৌকা যখন পুরো বোঝা নিয়ে দক্ষিণের হাওয়ায় সব পাল তুলে পদ্মার বুক বেয়ে ঢাকার দিকে আসত তখন এক-একটিকে মনে হত যেন সম্রাজ্ঞীর পূর্ণ গৌরবে ধীরগতিতে এগিয়ে আসছে। মনে পড়ত জন মেসফীল্ডের কবিতার কথা।

যে যাই বলুন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস থেকেই যাবে যে এই দুমুখো ডিনায়াল নীতিই বিক্রমপুরের ভয়াবহ সর্বনাশের জন্যে মুখ্যত দায়ী। ডিনায়াল নীতি অনুসারে একদিকে ধানচাল যথাসম্ভব নষ্ট বা অপসারণ করা, অন্যদিকে মালবহনের উপযোগী গোরুর গাড়ি ও যাবতীয় নৌকা ধ্বংস করার ফলে মুন্সীগঞ্জে চাল আমদানি মোটামুটি বন্ধ হয়ে যায়, যৎসামান্য যা আসত সবই লুকিয়ে-চুরিয়ে। ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৩-এর অকটোবর পর্যন্ত আমি নিজে অথবা বিশ্বস্ত ছাত্রকর্মী বা শিক্ষকের সাহায্যে প্রতিটি গঞ্জের খবর রাখতুম। খুব কম ধানচালেরই খোঁজ পাওয়া যায়। সুতরাং মহাজনরা চাল লুকিয়ে রেখে কালোবাজার সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ এনেছে বলে যে রাজনৈতিক জিগির উঠেছিল, অন্তত মুন্সীগঞ্জের পক্ষে তা খাটে নি। কংগ্রেসের পক্ষে ডিনায়াল-নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা সম্ভব হয় নি কারণ অধিকাংশ নেতাই ছিলেন জেলে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি হয়তো এ প্রশ্ন তুলতে পারতেন। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ মূলত যে মানুষের হাতের তৈরি, মুখ্যত সরকারের তৈরি, এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ থাকতে পারে না। সরকারের পক্ষ নিয়ে কেউ যদি বলতে চান, বড়ো জোর বলতে পারেন, জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনায় ভীতত্রস্ত হয়ে সরকার এই সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কর্মসূচী নেন। কিন্তু আসলে একটু ভেবে দেখলেই স্পষ্ট হত যে এই নীতির মূলে ছিল প্রতিহিংসাপ্রণোদিত শাস্তিদান যা পুরোদস্তর নারকীয় উৎপরতায় সম্পন্ন করা হয়।

মুন্সীগঞ্জে অত বেশি মৃত্যুর দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমটি হল—১৯৪১ সালের ডিসেম্বর থেকে দক্ষিণ বাঙলার জেলাগুলির থেকে চাল আমদানি হঠাৎ ভীষণভাবে কমে ১৯৪৩-এর প্রথম তিন মাসে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় কারণ হল—১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে যে চালের দাম ছিল মণ-পিছু তিন-চার টাকা, ডিসেমবর ১৯৪২-এ তা হল ষোলো টাকা, ১৯৪৩-এর সেপটেমবর মাসে হল নব্বই থেকে একশ টাকা। সে দামও বাড়তির মুখে রইল যতদিন না ওয়েভেলের চাল একটু বেশি করে আসতে শুরু করল। তফাত হল এই ১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে যে চাল ছিল পরিষ্কার কাঁকরবিহীন বালাম চাল, ১৯৪৩-এ অগস্ট-সেপটেমবরে সেটি হল ধুলো-কাঁকরে ভরা পাঁচমিশেলি চাল—বালাম নয়।

এই দুটি কারণের ফলে পাঠ্যপুস্তকে দুর্ভিক্ষে

মৃত্যু সম্বন্ধে পুঁথিগত অর্থনীতির যেসব ব্যাখ্যা আমরা সচরাচর পড়ি—যেমন ক্রয়শক্তি, কেনাবেচার গতিবিধি, একই পরিবারের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, শিশুর লিঙ্গ ও বয়সভেদে আহারের ও পুষ্টির মাত্রায় বৈষম্য, পরিবার-পিছু পুষ্টিমানানুসারে খাদ্যের বরাদ্দ, এই ধরনের গালভরা সংজ্ঞা বা মান, ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কোথায় তলিয়ে গেল। সরকার থেকে সারা বছরের চাহিদার শতকরা চল্লিশ ভাগও যদি সরবরাহ করা হত, তাহলে এইসব মান কতখানি কার্যকর ছিল তার আলোচনার মানে হত। বিক্রমপুরে জনহিতৈষিতার যে ঐতিহ্য ছিল, সমগ্র চাহিদার শতকরা চল্লিশ ভাগ সরবরাহ থাকলেও দুর্ভিক্ষ অত ভয়ঙ্কর রূপ নিত না। মুন্সীগঞ্জের ফল, শাকসবজি, জলেস্থলে উৎপন্ন শাকপাতাড়ি দিয়ে চালের ঘাটতি কোনোরকম কিছু মিটিয়ে সমবণ্টনের সাহায্যে মানুষের প্রাণ বাঁচানো যেত। একথা যে জোর করে বলছি তার যথেষ্ট কারণ আছে। দুঃস্থদের পরিবারে কাঁচা ধানচাল বিলি এবং লঙ্গরখানায় যে নিষ্ঠার সঙ্গে রান্নাকরা খাবার সমভাবে বাঁটা হত, তাতে যে যত্ন, সততা, বিবেচনা, দক্ষতা আর মানবিকতা প্রকাশ পেত তা আমি এখনও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি।

এই গেল হার্বার্টের প্রথম নীতি। হার্বার্টের দ্বিতীয় নীতি বলপূর্বক অপসারণ সম্বন্ধে দু-এক কথা না বললেই নয়। ১৯৪২-এর ১৭ সেপটেমবরের কেন্দ্রীয় বিধানসভায় ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী বাঙলা সরকারের 'অপসারণনীতি' যেভাবে কার্যকর করা হচ্ছিল তার বিশেষ নিন্দা করেন। খাদ্য, ওষুধপত্র, চিকিৎসা-ব্যবস্থা, অতিসাধারণ নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রের অভাবের কথা বলার পর তিনি এই সমস্যার উল্লেখ করেন। 'এর উপর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো এল হাজার-হাজার দরিদ্র নিরক্ষর গ্রামবাসীকে বল-পূর্বক অপসারণ।' এই ধরনের কয়েকটি অপসারণের উল্লেখ করে বললেন, '১৯৪২-এর ৪ এপ্রিল নোয়াখালি জেলার একটি দুটি নয়, পঁয়ত্রিশটি গ্রাম তড়িঘড়ি জনশূন্য করা হয়েছে।' বর্তমান কালে এগুলির সঙ্গে ইজরায়েলিদের দ্বারা প্যালেস্টিনিয়ানদের উৎখাত-হানার তুলনা করা চলে। তিনি আরো বললেন, 'ক্ষতিপূরণ এতই নামমাত্র আর মাপকাঠিহীন, যে কোনো সভ্য সরকারের পক্ষে এ ধরনের কাজ সম্ভব নয়। এ ধরনের কাজ তখনই সম্ভব যখন কোনো সরকার ত্রাসভরে পালাবার ব্যবস্থা করছেন। গ্রাম-বাসীদের গ্রাম থেকে মুলিবাঁশের দেয়াল বা ছাত শুদ্ধ তুলে নিয়ে যাবার সুযোগ দেওয়া হয় নি।'

শুধু দরিদ্র বা নিরক্ষরদের উপরেই নয়, হার্বার্টের অত্যাচারের কোপ স্থানীয় নেতৃবর্গের উপরেও পড়ল। ১৯৪০ সালে গান্ধীজীর আশীর্বাদ নিয়ে খাদি প্রতিষ্ঠানের সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত নোয়াখালির ফেনীতে গ্রামোন্নতির কাজ শুরু করেন। ১৯৪২-এর ১৯ জুলাই সরকারের আদেশে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জেলা ত্যাগ করতে বলা হয়। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন তিনি এ আদেশপালনে অপারগ, তার কারণ তিনি অপসারিত গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ আর পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ করছেন। আরো জানালেন, তিনি রাজস্বমন্ত্রী প্রমথনাথ ব্যানার্জিকে জানিয়েছিলেন যে বিহার সরকার এই ধরনের ক্ষেত্রে খালি-করা জমিতে এক বছরে যে ফসল জন্মায় তার দামের শতকরা ১১৫ ভাগ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে স্থলে যেনীতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মাত্র শতকরা ৫০ ভাগ। রাজস্বমন্ত্রী আর তাঁর সচিব বি. আর. সেন সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের আবেদনে যথেষ্ট সহানুভূতি দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের অসামর্থ্যও জানিয়েছেন।

উত্তর হিসাবে সতীশবাবুকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করে আলিপুর সেনট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিয়োগী এই বলে শেষ করেন :

'আজ ক্ষমতার আসনে এমন একজন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আসীন যিনি আজীবন ভারতের ঘোর

শত্রু বলে বিদিত। আরেকটি পরম দুঃখের বিষয় এই যে ভারতের ভিতরেই সমস্ত ক্ষমতা আজ তাঁদের হাতে যাঁরা একান্ত গোঁড়া প্রতিক্রিয়াশীল। এলাহাবাদ কংগ্রেস কার্যকরী কমিটি বৈঠকের বহু আগে থেকেই সারা দেশময় জনসাধারণের মনে সরকার সম্বন্ধে যে ব্যাপক অসন্তোষ ঘনিয়ে উঠছিল সে বিষয়ে গৃহমন্ত্রী কর্ণপাতমাত্র করাও প্রয়োজন মনে করলেন না। ফলে সাধারণের মন যখন গভীরভাবে তিক্ত হয়ে উঠল, ঠিক তখনই বর্মা থেকে উদ্বাস্তুরা অভূতপূর্ব সংখ্যায় দলে-দলে এসে পৌঁছল। তাদের বিরুদ্ধে জাতিবৈষম্যগত দুর্ব্যবহার ও অবহেলার কাহিনীতে ভারতীয় উদ্বাস্তুরা সারা দেশে সরকারের নিন্দায় মুখর হয়। সারা দেশময় ব্যাপক অসন্তোষের ফলে কংগ্রেস মরিয়া হয়ে যে সিদ্ধান্ত নেন তার শাস্তি-স্বরূপ কংগ্রেস নেতাদের যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়, তার ফলে দেশে যেসব অবাঞ্ছনীয় ঘটনাবলী ঘটে তাদের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্তমান অবস্থার বিচার করা উচিত।'

যেদিন নিয়োগী এই বক্তৃতা দেন সেদিনই, তাঁর আগে, ইওরোপীয় দলের নেতা পি. জে. গ্রিফিথস (যিনি আই. সি. এস. থেকে পদত্যাগ করেন), এবং তার আগের দিন অ্যাংলো-ইনডিয়ান দলের ফ্র্যাঙ্ক অ্যান্টনি ঠিক একই সুরে একই অভিযোগ করেন। 'ব্রিটিশদের সদিচ্ছা ও অন্তরের অভিপ্রায় বিষয়ে সারা দেশে জনসাধারণের মধ্যে যে অবিশ্বাস আজ বর্তমান', সে বিষয়ে বলেন গ্রিফিথস। এক সঙ্গে তিনি অতিসাধারণ নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী—যথা খাদ্য-শস্য বা কেরোসিন—যথেষ্ট পরিমাণে মজুত না রাখা সরকারের তরফে অমার্জনীয় অবহেলা বলে তিনি সরকারকে অভিযুক্ত করেন; বলেন, তারই ফলে কংগ্রেস বিরোধিতার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন সারা দেশের আত্মাভিমানের উপর কিভাবে পদাঘাত করেছেন, তার ফলে দেশে কী পরিমাণ নৈরাশ্য আর নঞর্থক ভাব এসেছে, অ্যানটনি তার উল্লেখ করেন।

দুর্ভিক্ষের অপ্রতিহত গতি

মেদিনীপুর সাইক্লোনের ভয়াবহ ফলাফলের গুঞ্জন ওঠার আগে, এবং সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের ফলে, খাদ্য পরিস্থিতি কত যে খারাপ হল তার খুঁটিনাটি জানা-জানি হবার আগে, দুর্ভিক্ষের যে দুর্বিপাক দ্রুত এগিয়ে আসছিল সে বিষয়ে ১৯৪২-এর ডিসেমবর মাসে আমার কী মনে হয়েছিল সে বিষয়ে যত সম্ভব সংক্ষেপে পারি এখানে বলি। প্রথমত বলি, ১৯৩৯-এর অগস্ট মাস থেকে ১৯৪২-এর জুন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর পাইকারি দামের সূচী ১০০ থেকে ১৮২ পয়েনটে উঠে যায়। এই দুই সূচীর পার্থক্যের অর্ধেকের বেশি ওঠে ১৯৪২ সালের প্রথম ছয় মাসে। সারা দেশময় সকলের মোটামুটি একই ধারণা হয় যে এই বৃদ্ধির জন্যে মূলত দায়ী লিন-লিথগোর ঔদাসীন্য আর বৈরীভাব। এই মনোভাবের প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ থাকে ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী, আবদুল হালিম গজনভী, পি.জে. গ্রিফিথস, ভারত সরকারের খাদ্যসদস্য জে. পি. শ্রীবাস্তবের মতো বিভিন্ন জগতের ব্যক্তিদের প্রকাশ্য উক্তিতে। অন্যদিকে বাঙলার খাদ্যমন্ত্রী আজিজুল হক-ই কেবল যেন রাজার থেকে বেশি রাজভক্তি দেখাতেন। তবে কি তিনি হার্বার্টের ভয়ে করতেন? এই মর্মন্তুদ সময়ে যতদিন বেঁচে ছিলেন হার্বার্ট তাঁর কাজে ও কথায় যে অবহেলা আর অনীহা দেখান তাকে একান্ত গর্হিত ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। চাষি ও গ্রামের ছোটো আড়তদারের হাতে খাদ্যশস্যের গোপন মজুতের যেসব গল্প তখন চালু ছিল সেগুলি যে কত অতিরঞ্জিত, তা মুন্সীগঞ্জের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি। এর সমর্থন বাঙলার ধানচাল বিষয়ক অনু-সন্ধান কমিটির রিপোর্টেও আমরা পাই। বাঙলায়

শতকরা আশিজনের ক্রয়শক্তি এতই কম ছিল যে গোপন মজুতের অভিযোগ যদি সত্যি হত তাহলে ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসের মধ্যে চালের দাম যখন পাঁচ-ছয় গুণ বেড়ে গেল তখন লাভের লোভে নতুন চাল আসার আগে গোপন মজুত আপনিই বেরিয়ে আসত।

১৯৪২-এর অগস্টের পর ১৯৪৩ সালে যতদিন পর্যন্ত লিনলিথগো ছিলেন, তখন তাঁর প্রতাপ এত ছিল যে মুখের কথা খসতে না খসতে কাজ হত। কিন্তু না লিনলিথগো, না হার্বার্ট, যেসব প্রদেশে ফসল ভালো হয়েছিল তাদের কাছে শস্যদ্রব্যের জন্যে সামান্যমাত্র আবেদন জানান নি।

এসবের উপরে আবার প্রদেশ সরকারের তরফে মুনাফা করার প্রবৃত্তির প্রশ্নও ছিল। পানজাবের রিজিওনাল খাদ্য কমিশনার কলিন গার্বেট হিসাব দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—সিন্ধু ও পানজাব সরকার বাঙলার দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কী ধরনের অন্যায্য মুনাফা আদায় করলেন এবং সেই দুষ্কৃততে কেন্দ্রীয় সরকার কীরকম হাসিমুখে সায় দিলেন। ওদিকে পানজাবের রাজস্বমন্ত্রী ছোটুরাম বাঙলা সরকারকে অন্যায্য লাভ করার জন্যে এইভাবে অভিযুক্ত করলেন: 'কলকাতায় যখন পানজাবের গম পৌঁছয় তখন তার দর পড়ে মণপিছু সাড়ে বারো টাকা। বাঙলা সরকার সেই গম মিলকে বিক্রি করেন পনেরো টাকা দরে। মিলকে আটাভাঙানির জন্যে মণপিছু চার টাকা দিয়ে ফের মণপিছু উনিশ টাকা দরে আটা কিনে জনসাধারণকে বিক্রি করেন কুড়ি টাকা দরে।' সাফাই হিসাবে বাঙলা সরকার বলেন, তাঁরা আটা আর গম দূর-দূর জেলায় নানাবিধ যানবাহনে পাঠানোর (মুন্সীগঞ্জে অবশ্য তার কণামাত্রও আসে নি) খরচ মেটাবার জন্যে একটি স্থিতিস্থাপকতা তহবিল খুলেছিলেন। বাঙলা সরকার বললেন, 'এই ফানড সত্ত্বেও পানজাবের গম কেনার চুক্তির ফলে বাঙলা সরকারের মোট সাত লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।' শুনে ছোটুরাম পুনরায় খাপ্পা হলেন।

বোঝার উপর শাকের আঁটি। বাঙলায় সরবরাহ অবস্থা আরো খারাপ হল যখন ধান-চাল-গম চালানের ওয়াগনগুলি ১৯৪১ আর ১৯৪২ সালে যুদ্ধের মাল সরবরাহের জন্য নিয়মিতভাবে বিদেশে রপ্তানি করা শুরু হল। উপরন্তু ১৯৪২-এর ৮ই অগস্ট থেকে বাঙলা প্রদেশের সঙ্গে উত্তর ভারতের রেলসংযোগ এক-এক খেপে অনেকদিন ধরে বিচ্ছিন্ন থাকত। অবশ্য রেলসংযোগ বিচ্ছিন্ন না হলেও বাঙলার যে খুব সুরাহা হত তা বলা যায় না, হার্বার্ট আর তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীরা তারও সুব্যবস্থা অনায়াসে করতে পারতেন। তার কারণ, ১৯৪৩-এর শেষে আমার চিঠিপত্র পাঠানো সম্বন্ধে যখন একটা তদন্ত হল তখন দেখা গেল, ১৯৪২-এর ডিসেমবর থেকে প্রতি সপ্তাহে ধান-চাল চেয়ে অন্তত একটি করে যে টেলিগ্রাম আমি পাঠাতুম তার সবগুলিই রাইটার্স বিল্ডিংসের দপ্তরে ধুলোচাপা পড়ে ছিল, একটিও মন্ত্রীকে দেখানো হয় নি।

সব দুর্বিপাকেরই একটা না একটা সুফল ফলে। ধানচালের ব্যবসায়ে সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানদের আগে থেকে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। সরকার থেকে এই দুর্যোগে অনেক মুসলমান ব্যাপারী ধান-চাল সংগ্রহের ঠিকাদারি পেলেন, পরে খুচরো রেশনশপের দোকানদারিও পেলেন এসব ক্ষেত্রে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কিছু-কিছু গরিব ব্যাপারী উপর-তলার মুসলমান ব্যাপারীর মাৎস্যন্যায়ের শিকার হলেন।

লিনলিথগো আর হার্বার্ট সবথেকে বেশি অপরাধ করলেন আশু দুর্যোগের বহু তথ্য ও নিহিতার্থ ব্রিটিশ পার্লামেনটের কাছে গোপন করে অথবা তাদের যথার্থ গুরুত্ব না জানিয়ে। এ বিষয়ে এমেরিও যথেষ্ট দোষী ছিলেন মনে হয়, যদিও তাঁর ডায়ারিতে তিনি চার্চিলের ঘাড়ে দোষ চাপান। অবশ্য ১৯৪৩-এর জানুয়ারি মাসে পার্লামেনটে যে আলোচনা হল তাতে বোঝা গেল তাঁরা সব কিছু একেবারে চাপতে পারেন নি। পার্লামেনটের যেসব সভ্য ভারত বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন তাঁরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ভারতীয় সূত্রে খবর রাখতেন। আমেরিকা, এমনকী পৃথিবীর অন্যান্য দেশের থেকেও ভারতের খবর আমেরি লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। মহাযুদ্ধের মানচিত্রে এত বড়ো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটির দেশবাসীকে সন্তুষ্ট এবং বন্ধুভাবাপন্ন রাখার জন্য আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়া প্রশান্তমহাসাগরপথে খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয় প্রাণপণ চেষ্টা করত, বিশেষত তাদের দেশে যখন ভূরিভূরি গম মজুত ছিল। যেসব আমেরিকান কাগজের নিজস্ব সংবাদদাতারা ভারত থেকে সংবাদ পাঠাতেন তাঁরা অত্যন্ত উদ্বেগজনক সব সংবাদ পাঠাতেন ঠিকই; কিন্তু, এক সরকার থেকে অন্য সরকারের কাছে যেসব সরকারি তথ্য বা সংবাদ যেত তাতে দুর্ভিক্ষের উল্লেখ থাকত নিতান্তই সামান্য।

সংবাদ চেপে রাখার ব্যাপারটি কতদূর গড়িয়েছিল সেটা বোঝা যায় একটি ব্যাপারে। লাহোরের "সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট" পত্রিকাটি বিখ্যাত হয় রাডিয়ার্ড কিপলিং-এর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহিমাকীর্তনমূলক কবিতাগুলি ছেপে। সে পত্রিকাটিকে ব্রিটিশ-বিরোধী আখ্যা কেউ দিতে পারবে না। পত্রিকাটি পর্যন্ত এই কথাগুলি লিখতে বাধ্য হয়:

> প্রকৃত কথা হচ্ছে, বাঙলা সরকারের তথ্য বিভাগ প্রত্যহ কত মৃত্যু হয়েছে, কতজনকে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তার যে হিসাব দেন, সে হিসাব তারযোগে বিদেশী সংবাদদাতারা স্বদেশে পাঠাতে পারেন না। মন্বন্তরের কিছু-কিছু খবর পাঠাবার অনুমতি তাঁরা তখনই পান যখন মর্মন্তুদ হিসাবগুলির সঙ্গে কী-কী উপায়ে মন্বন্তর রোধ করার বিপুল প্রয়াস করছেন—যার প্রায় কোনোটাই কাজের হিসাব নয়, শুধু সদিচ্ছার তালিকা—সেগুলিও তাঁদের তথ্যের সঙ্গে পাঠাতে রাজি হন। দুর্ভিক্ষের কেবল নিরাভরণ তথ্যাদি বিদেশী পত্রিকার প্রতিনিধিরা ব্রিটিশ বা আমেরিকান পাঠককে দিতে পারবেন না।

১৯৪২-এর ডিসেমবরের তৃতীয় সপ্তাহে একজন আমেরিকান প্রতিনিধি তাঁর কাগজে এই সংবাদ পাঠান: 'অগণিত ভারতীয়দের বেলায় অহরহ ক্ষুধা আর সত্যিকারের অনশনের মধ্যে সীমারেখাটি নিতান্তই সূক্ষ্ম। গত সপ্তাহে এই রেখাটি সূক্ষ্মতর হয়ে পড়ল।' রেখাটি কত সূক্ষ্ম হতে পারে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৯৪৩-এর অগস্টে।

মেদিনীপুর: ডিনায়াল, সাইক্লোন ও দমননীতি

১৯৪৩-এর ১২ই ফেবরুয়ারি নিজের ইস্তফার উপর বিধানসভায় শ্যামাপ্রসাদ যে বক্তৃতা দিলেন তাতে বলেন যে ফজলুল হক বারংবার দাবি করা সত্ত্বেও হার্বার্ট কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ১৯৪২-এর ৯ই অগস্ট আন্দোলন বিষয়ে কী-কী ব্যবস্থা করতে হবে, সে বিষয়ে যেসব নির্দেশ এসেছিল তা ফজলুল হককে আদৌ জানান নি। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্রিটিশ আই-সি-এস অফিসারই শুধু আন্দোলন কিভাবে দমন করতে হবে তার প্ল্যান আর নির্দেশ বিষয়ে অবহিত ছিলেন, আর কেউ নয়। আন্দোলন যখন নিঃশেষ হয়ে গেল, তার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের খুঁটিনাটিগুলি মন্ত্রীদের জানানো হল। তার আগে নয়। তা সত্ত্বেও, মেদিনীপুর জেলায় কী উপায়ে দমননীতি কার্যকর করা হয়, কী কী শাস্তির ব্যবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে সমস্ত কিছু তথ্য শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়।

তিন দিন পরে, ১৫ই ফেবরুয়ারির বিতর্কে, তমলুক আর কাঁথি মহকুমায় দমননীতি কী নৃশংসভাবে চালানো হয়, সে বিষয়ে ভূরি-ভূরি রোমহর্ষক বিবরণ দেওয়া হল। মেদিনীপুরের অসংখ্য নিরীহ

ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা থেকে শুরু করে, বাড়িঘরদোর ধ্বংস তথা পোড়ানো, নারীপুরুষনির্বিশেষে বেধড়ক মারধোর আর নির্যাতন, তার সঙ্গে খুন আর নারী-ধর্ষণ—কোনোটাই বাদ যায় নি। ফজলুল হক তখনও মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সরকারের পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইবার চেষ্টায় বললেন, তমলুক আর কাঁথির মানুষ কিভাবে সে ছুটি মহকুমায় পালটা সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্যামাপ্রসাদ বললেন, তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যেতে পারে, তাদের এই কাজ সরকারের সন্ত্রাস আর দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে হয়েছিল। পরক্ষণেই তিনি সভ্যদের বললেন, ১৯৪২-এর শুরুতে, অগস্ট আন্দোলনের বহু আগে পোড়ামাটি বা ডিনায়াল নীতি যে ভয়ঙ্কর নৃশংসভাবে কার্যকর করা হয়েছিল, তার কী জবাবদিহি থাকতে পারে? আমার নিজের তখন ধারণা হয় ত্রিশের দশকে মেদিনীপুরে যেসব বিদ্রোহ হয়, ইংরেজ কর্মচারী হত্যা করা হয়, এবং সেই ক্ষতের উপর নিরাময়ের প্রলেপ লাগানোর জন্যে বি-আর-সেনকে পাঠাতে সরকার বাধ্য হন, সেই অপমানের প্রতিশোধ হিসাবে ডিনায়াল নীতির আড়ালে আগুন আর গুলির শরণ নেওয়া হয়। ১৯৪২-এর প্রথম ছ মাস ধরে নৌকা, গোরুর গাড়ি, অন্যান্য যানবাহন নষ্ট করে, তার সঙ্গে দশ হাজারের বেশি সাইকেল বাজেয়াপ্ত করে নষ্ট করার অবিরাম যজ্ঞ চলে। আইন ও শান্তির মালিকরা গ্রামের পর গ্রাম, বাড়ির পর বাড়ি লুঠ করে, পুড়িয়ে, নারীপুরুষনির্বিচারে সকলের উপর বর্বরের মতো অত্যাচার করেছে। সে বিতর্ক আজও পড়লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে।

রাজনৈতিক হাঙ্গামার মাসগুলিতে এবং ১৬ই অকটোবরের সাইক্লোনের পর মেদিনীপুরের অবস্থা জানতে চেয়ে যখনই মন্ত্রিসভা হার্বার্টের কাছে অথবা উচ্চতম কর্মচারীদের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অথবা তথ্য ও সংবাদ বিষয়ে অনুরোধ করেছেন, প্রতি-বারেই তাঁরা একই উত্তর পেয়েছেন: মিলিটারির স্বার্থে কোনো সংবাদ দেওয়া নিষিদ্ধ। ১৯৪২ সালের প্রথম দশ মাস মেদিনীপুরের কিছুমাত্র খবরই পাওয়া যায় না। প্রথম খবর পাওয়া গেল যখন শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে কয়েকজন মন্ত্রী মেদিনীপুরের নানা স্থানে পাঁচ দিনের সফর শেষ করে ৪ঠা নভেম্বরের কলকাতায় ফিরে হার্বার্ট আর চীফ সেক্রেটারির অনুরোধ অমান্য করে যেটুকু দেখেছেন তার বিবরণ দিলেন।

শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ভাষণে হার্বার্টের বিধ্বস্ত কর্মচারীদের ছোটো গোষ্ঠীর ঔদ্ধত্য ও বেয়াদবির কিছু-কিছু উদাহরণ দিলেন। একটি উদাহরণে বললেন, একজন ব্রিটিশ কর্মচারী কাগজে-কলমে লেখেন: 'সম্রাটের কর্মচারী হিসাবে তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের কী হারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে সে সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ মানতে পারেন না, কারণ তাঁর মতে সেসব ক্ষতিপূরণের চেয়ে উদ্বাস্তুরা যা পাবার উপযুক্ত তার থেকে অনেক বেশি পায়।'

শ্যামাপ্রসাদ আরো বললেন, মন্ত্রিসভার কাছ থেকে সরকারের নীতি গুপ্ত রাখার মানেই হচ্ছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না। গভর্নরের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের হাতে যতখানি সম্ভব ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। তিনি বললেন: 'যে যে বাড়িতে পুলিশ বা মিলিটারির আদেশে হানা পড়ে, অথবা আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করা হয়, তার বিশদ বিবরণ দিয়ে লম্বা-লম্বা তালিকা দিয়েছিলুম। এই ধরনের আরো একটি বড়ো লম্বা তালিকা, যেদিন ভয়ঙ্কর সাইক্লোন হয়, অর্থাৎ ১৬ই অকটোবর, তার ঠিক পরের দিনই, আমি আমাদের গৃহ দপ্তরের কয়েকজন উচ্চতম কর্মচারীকে দিয়ে অনুরোধ করি যেন এই ধরনের বর্বর অত্যাচার এই মুহূর্তে বন্ধ করা হয়। তিনি তাঁর বক্তব্য একটু পরিবর্ধিত করে আরো বলেন, তিনি শ্রেণী হিসাবে সব কর্মচারীকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নীতির বিরোধী বলে দোষী করছেন না, কারণ তিনি এমন অনেক ব্রিটিশ ভারতীয় কর্মচারীকে জানেন প্রদেশের সেবায় যাঁদের দান অপরিমেয়।

এই অভূতপূর্ব অত্যাচার আর তাণ্ডবলীলার খবরের সঙ্গে সাইক্লোন বিষয়ক যাবতীয় সংবাদ একেবারে চেপে দেওয়া হয়। সমস্ত খবর চেপে দেওয়ার ফলে জেলাটি বর্ণনাতীত দুঃখে আর যন্ত্রণায় অভিভূত হয়। ১৯৪২-এর ২রা নভেম্বর অর্থাৎ শ্যামাপ্রসাদের দল ফেরার দুদিন আগে বাঙলা সরকার একটি ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রগুলিকে দেন। বিজ্ঞপ্তিটি দেওয়া হল টাইফুন আর সাইক্লোন সারা বাঙলার সমতট জেলাগুলিকে বিধ্বস্ত করার পুরো ষোলো দিন পরে। ইতিমধ্যে জাপানি রেডিও বারং-বার বেতারে প্রচার করেছে যে সাইক্লোনের প্রথম একটি ঘণ্টায় মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় লক্ষাধিক প্রাণ নষ্ট হয়েছে। অথচ বাঙলা সরকারের বিজ্ঞপ্তিটি ছিল এই: 'বঙ্গোপসাগর থেকে বড়ো একটি সাইক্লোন ১৬ অকটোবর তারিখে বাঙলার কয়েকটি জেলার উপর দিয়ে যায়। ১৬ অকটোবর সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে সাইক্লোন শুরু হয় ও ১৭ তারিখের সকালে বন্ধ হয়।'

এর আগে অবশ্য কিছু সংবাদ বেরিয়েছিল, '১৬ অকটোবর বাঙলার যেসব জেলার উপর দিয়ে সাইক্লোন যায়, তার মধ্যে ছিল ২৪ পরগনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং নোয়াখালি।' মেদিনীপুরের উল্লেখ নেই, কারণ মেদিনীপুর সম্বন্ধে কোনো সংবাদই ছাপার অনুমতি দেওয়া হয় নি। উলটে বাঙলা সরকারের তরফ থেকে একটি সতর্কবাণী জারি হয়ে-ছিল যে কোনো সংবাদপত্রই মেদিনীপুর জেলায় কী হয়েছে তার কোনো খবর কোনোমতে ছাপতে পারবে না।

পরে জানা যায়, ১৬ অকটোবরের টাইফুন আর সাইক্লোনের প্রথম পনেরো মিনিটে ত্রিশ হাজারের বেশি লোক প্রাণ হারায়। মৃতদের মধ্যে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষদের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল, কারণ পুরুষরা বাড়ি ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু রক্ষার জন্য ঘরের বাইরে যায়। মেদিনীপুর আর ২৪ পরগনায় সব মৃত্যুর সংখ্যা আরো কয়েকগুণ হয়।

আমাদের বন্ধু শ্রীমতী কনক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ১৯৯০ সালে কিছু বিবরণ শুনেছি। ১৯৪২ সালের ডিসেমবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তাঁরা মধ্য-প্রদেশের পেন্দ্রারোড স্টেশন থেকে ট্রেনে হাওড়ায় ফিরছিলেন। তাঁর বিবরণ শুনে আমার ধারণা হয়, যেসব রিপোর্ট পরে প্রকাশিত হয়েছিল তার থেকে আসল ধ্বংসলীলা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর হয়েছিল। অকটোবরের শেষে হাওড়া স্টেশনে তাঁদের ট্রেন সকালে পৌঁছনোর কথা ছিল। কিন্তু বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লাইন সাইক্লোনে এত বিধ্বস্ত হয় যে যুদ্ধোচিত ত্বরা সত্ত্বেও দু মাস পরেও মেদিনীপুর জেলার উপর লাইন ভালো করে মেরামত হয় নি। ফলে তাঁদের ট্রেন ঝাড়গ্রাম থেকে হাওড়া পৌঁছতে, সাড়ে তিন ঘণ্টার বদলে, পুরো একটি দিন নেয়। বালিচক থেকে মেচেদা রেলপথে মাত্র ৩৩ কিলো-মিটার। সেটুকু পরিক্রমা করতে লাগে চার ঘণ্টার উপর। লাইনের দু পাশে, বিশেষত দক্ষিণ পাশে, যতদূর চোখ যায় টেউতোলা বালির সমুদ্র, মাঝে-মাঝে শুধু জেগে আছে এক-আধটি মরা গাছের গুঁড়ি, শেকড়গুলি আকাশের দিকে তোলা। মনে হয়, যমদেব তাঁর তরোয়াল চালিয়ে সারা দেশটি কেটে শুইয়ে দিয়েছেন। সারা দেশ বালিতে ভরা, তার উপরে সর্বত্র রাশি-রাশি মানুষের, জীবজন্তুর মাথার খুলি, কঙ্কাল আর হাড়, দু বছর ধরে রোদ্দুরে পুড়ে খড়ির মতো সাদা হয়ে গেছে, রোদ্দুরে চোখে লাগে। ছেচল্লিশ বছরের পূর্বের স্মৃতি বলার সময়ে তাঁর শরীর যেভাবে মাঝে-মাঝে শিউরে উঠছিল তাতেই বোঝা গেল জাপান রেডিও যে প্রচার করেছিল একরাতে লক্ষাধিক লোক মারা যায়, গোরু আর অন্য গৃহ-পালিত পশুর তো কথা ওঠে না, সে উক্তি বোধ হয় মোটেই অতিরঞ্জিত ছিল না।

আগেই বলেছি, একরাত্রির তাণ্ডবে স্ত্রীমৃত্যুর

তুলনায় পুরুষমৃত্যু অনেকগুণ বেশি হওয়ার ফলেই বোধ হয় হাজার-হাজার স্ত্রীলোক ছোটো ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় বাড়িতে-বাড়িতে, ১৯৪২-এর ডিসেমবর মাস থেকে একটু ফ্যানের সন্ধানে ঘুরতে বাধ্য হয়, এবং তখনই মোটা-মুটি দুর্ভিক্ষের শুরু হয়। পুরুষরা অনেক বেশি হারে মারা না গেলে, সম্ভবত নারী আর শিশুদের বদলে পুরুষরাই রাস্তায়-রাস্তায় 'ঘুরত'। ভিক্ষার আশায় এইভাবে যত্রতত্র ভেসে-ভেসে বেড়ানো আগের কালের দুর্ভিক্ষেও ব্যাপকভাবে দেখা গেছে। এই ধরনের ঘোরার ফলে মৃত্যুর হারও বেড়ে যায়।

সাইক্লোনঘটিত দুর্বিপাকের সুরাহা করার জন্য সরকার কী ধরনের ব্যবস্থা করলেন? পরে শোনা গেল, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর রিপোর্টে নাকি সুপারিশ করেন, 'মেদিনীপুরবাসীর রাজনৈতিক দুষ্কৃতির শাস্তি হিসাবে সরকারের ত্রাণকার্যে নামা তো উচিত হবেই না, উপরন্তু কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানকেও বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে একমাসের মধ্যে ত্রাণকাজে নামার অনুমতি দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে না। এই সুপারিশ করা হয় 'বিদ্রোহীদের শিক্ষা' দেবার উদ্দেশ্যে। আত্মস্তরিতায় স্ফীত সেক্রেটারিয়েট কমানডগোষ্ঠীর অনুমোদিত 'দিনমানে ত্রাণকার্য, নিশীথে হানা ও অত্যাচার, এই উন্মাদসুলভ কার্য-নীতি'—এই কথাগুলি শ্যামাপ্রসাদ নিজের বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ হিসাবে তাঁর লিনলিথগো ও হার্বার্টকে লেখা চিঠিতে ব্যবহার করেন। সরকারের আদেশে এই চিঠি দুটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এবং তাদের বিষয়ে আলোচনাও সরকারি আদেশে বন্ধ করা হয়। আদেশ জারির সমর্থনে বলা হয়, 'জনৈক মন্ত্রীর পক্ষ থেকে তথাকথিত স্বৈরতন্ত্রসুলভ কুশাসন-অভিযোগের জবাব হিসাবে কৈফিয়ত বা তথ্যসহ উত্তর দেওয়া নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, এবং তার সঙ্গে অভিযোগপত্র নিষিদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।' "নেটিভ"দের সম্বন্ধে এই ধরনের উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে দেখে কলকাতার "রাজ"-ভক্ত ভারতীয়রা নিশ্চয় আত্মপ্রসাদ লাভ করবেন।

কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ও হার্বার্ট

১৫ ফেবরুয়ারি ১৯৪৩-এর বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব প্রসঙ্গে নাজিমুদ্দিন মন্তব্য করেন: 'যদি মন্ত্রিসভার বিবেচনায় মেদিনীপুর জেলায় সহনাতীত অত্যাচার হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে অভিযোগ-গুলি সম্বন্ধে এই সভা এবং প্রত্যেক সভ্যের অভিযোগ-গুলির তদন্ত দাবি করা উচিত।' প্রত্যুত্তরে ফজলুল হক ঘোষণা করলেন, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট বিচারকদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত করানো হবে।

ব্যস, আগুনে ঘি পড়ল। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ২৮ মার্চ ইস্তফার কথা ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই বিধানসভায় উল্লেখ করে বলেন, ১৫ ফেবরুয়ারি, সোমবার, হার্বার্ট তাঁকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠির শেষে ছিল, 'আজ সকালে আপনি সরকারের সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেছেন, মেদিনীপুরের কর্মচারীদের কার্যকলাপ বিষয়ে তদন্ত হবে। এই ঘোষণার আগে আপনি আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন নি। আপনি কেন করেন নি সে বিষয়ে কাল সকালে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে আমি আপনার এই আচরণের জবাবদিহি প্রত্যাশা করব।' এর উত্তরে হার্বার্টকে লেখা তাঁর ১৬ ফেবরুয়ারির চিঠি ফজলুল হক এইভাবে শুরু করেন, 'আমি আপনাকে জানাতে চাই আমি সরকারের সিদ্ধান্ত বিধানসভায় ঘোষণা করার আগে আপনার মত চাই নি, তার জন্যে আপনার কাছে কোনো জবাবদিহি দিতে বাধ্য নই। উলটে, আপনার প্রতি আমার একটি অবশ্য কর্তব্য আছে। সেটি হচ্ছে আপনাকে আমি মৃদুভাবে সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য মনে করি যে ভবিষ্যতে গভর্নরের স্বাক্ষরে মুখ্যমন্ত্রীকে পত্র লেখার সময়ে আপনার এই চিঠিতে যে ধরনের অশোভন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তার যেন

পুনরাবৃত্তি না ঘটে।' কেন কমিটি নিযুক্ত করেছেন সে সম্বন্ধে চিঠিতে উল্লেখ করে তিনি লিখলেন কি-ভাবে সরকারি কর্মচারীরা ভব্যতার খাতিরেও নাম-কা-ওয়াস্তে কোনো তৎপরতা দেখান নি। আরো লিখলেন, হার্বার্ট যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁর চিঠি ফজলুল হক বিধানসভায় পড়ে শোনাবেন। এর পরিণামে বিধানসভায় একবাক্যে সকলে বললেন, হার্বার্টের প্রত্যাবর্তন দাবি করা হোক।

আগের ডিসেমবর থেকেই অবশ্য মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন নিয়ে হার্বার্ট ও ফজলুল হকের মধ্যে মতান্তর এবং দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই বিধানসভায় ফজলুল হক হার্বার্টকে ১৯৪২-এর ২ অগস্টে লেখা একটি চিঠি প্রকাশ করেন। সে চিঠিতে তিনি হার্বার্টের কাছে অনুযোগ করে লিখেছিলেন যে হার্বার্টের কার্য-কলাপ সংবিধানের নির্দেশবিরুদ্ধ হচ্ছে। সেই সঙ্গে অনুরোধ করেন তিনি যেন সব বিষয়ে সংবিধান অনুসারে চলেন। ১৯৪৩-এর ৫ জুলাই হক আরো বলেন—গত ২৮ মার্চ কী করে হার্বার্ট হককে ধাপ্পা দিয়ে একটি ঝুটো দলিলে হকের ইস্তফাপত্র সই করিয়ে নেন।

হক এই তাঁর ৫ জুলাইয়ের বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলেন নি তাঁর নাকের ডগায় হার্বার্ট ঠিক কী ধরনের প্রলোভন ঝুলিয়ে ইস্তফাপত্র লিখিয়ে নেন। হকের নিজের বিবৃতিতে এই মনে হয়, হার্বার্ট যদি কোনো প্রলোভন ঝুলিয়ে থাকেন তবে তা মুখ্যমন্ত্রিপদের নয়। যাই হোক, আগে থেকে তৈরি করা একটি ইস্তফাপত্র হকের সম্মুখে এগিয়ে দিয়ে হার্বার্ট সেটি সই করিয়ে নেন। সেই দিনই, অর্থাৎ ২৮ মার্চ সংবিধানের ৯৩ ধারায় গভর্নরের শাসন জারি হয়। ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল নাজিমুদ্দিনকে মুখ্যমন্ত্রী এবং শহীদ সুরাবর্দীকে খাদ্যমন্ত্রী করে কোয়ালিশন সরকার ঘোষিত হয়।

সে সময়ে আমার মনে হার্বার্ট সম্বন্ধে দুটি সন্দেহ দৃঢ় হয়। মন্ত্রিসভা এইভাবে পুনর্গঠন করে তিনি দুটি অভিসন্ধির মধ্যে প্রথমটি সিদ্ধ করেন—আমার মতে সেটি ছিল বাঙলার রাজনীতিমঞ্চের মধ্যস্থলে মুসলিম লীগকে প্রতিষ্ঠিত করা। দ্বিতীয়টি ছিল যতদিন সম্ভব খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী থেকে বাঙলাকে বঞ্চিত ও বুভুক্ষু রাখতে হবে। ১৯৪৩-এর সেপটেমবর হার্বার্ট গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় দ্বিতীয় সিদ্ধিতে বাধা পড়ল। হার্বার্টের স্থলে ৬ই সেপটেমবর বাঙলার লাট-পদে রাদারফোর্ড এলেন। ১৯৪৩-এর ১১ই ডিসেমবর হার্বার্ট মারা গেলেন।

নভেমবর মাসে রাদারফোর্ড মুন্সীগঞ্জে সফরে এলেন। তিনি হার্বার্ট থেকে ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। মনে হল তিনি সেই ধরনের আই-সি-এস ছিলেন যাঁকে আমি কল্পনায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতুম, এবং যে ধরনের অফিসার আমার যুগে প্রায় লোপ পেয়েছে। রাদারফোর্ড, ও-এম মার্টিন ও এ-এস লার্কিন—আমার জীবনে আমি মাত্র তিনজন ইংরেজ অফিসারকে দেখেছি যাঁদের প্রতি আমি অকুণ্ঠ আনুগত্য দিতে রাজি হতুম।

বললে রূঢ় শোনায়, কিন্তু হার্বার্টের মৃত্যুতে মনে হয়েছিল, গেছে আপদ গেছে। লিনলিথগো বিদায় নিলেন ভারতের রাজনৈতিক জীবনে গভীর ক্ষতি-সাধনের পর। ১৯৪৩-এর ২০শে অকটোবর ওয়েভেল বড়লাট-পদে আসীন হলেন।

সেপটেমবরে রাদাফোর্ড আসার পর বাঙলার দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হল। অকটোবরের শেষে ওয়েভেল আসার পর সেই উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হল। ২৬শে অকটোবর ওয়েভেল, তাঁর স্ত্রী ও রাদারফোর্ড কলকাতায় রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে ফুটপাথে নিরাশ্রয় বুভুক্ষুদের অবস্থা দেখে বেড়ালেন। দুজনে মিলে তাঁরা বাঙলায় প্রাণ আনলেন। ইতিমধ্যে অব্যবস্থা দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছিল।

এক-এক সময়ে আমার মনে হয় এডমানড ক্লোরিহিউ বেনটলি নিশ্চয় ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা হয়ে দিব্য চক্ষে হার্বার্টকে দেখে তাঁর "ছোটদের জন্য জীবন-

কাহিনী"তে ক্লাইভের উপরে এই লাইনগুলি লিখেছিলেন :

রবার্ট ক্লাইভ যে বেঁচে নেই
তাঁর বিষয়ে এর থেকে ভালো কিছু
আমার জানা নেই।
গত হবার সপক্ষে
অনেক কিছু বলার আছে॥

আর তাঁর এই কবিতাটি, তিনি এমেরি নালিন লিথগো, কাকে বেশি মানসচক্ষে দেখে লিখেছিলেন, আমি স্থির করতে পারি না।

সম্রাট তৃতীয় জর্জের
জন্মানোই উচিত হয় নি।
ভাবলে অবাক হতে হয়
এ বীভৎস ভুল কী করে সম্ভব হয়॥

বিক্রমপুরে দুর্ভিক্ষের অগ্রগতি

আমার বিক্রমপুরের ছোট্ট জগতে এখন ফেরা যাক।

১৯৪২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশনের জনাদুয়েক ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করে বলে ডিনায়াল নীতি ও ব্যাপকভাবে চালের নৌকা ধ্বংসের ফলে দক্ষিণের জেলাগুলি থেকে ধান-চাল আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে, এবং আড়তদারেরা মজুত ধানচাল লুকোতে শুরু করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয়ার্ধেই চালের মণ সাড়ে তিন টাকা থেকে পাঁচ টাকায় উঠে গেল। ছেলে দুটি আমাকে মিরকাদিমের তিন-চারটি বড়ো-বড়ো আড়তদারের নাম বলল। তাঁদের মধ্যে একজন—বসন্ত মণ্ডল—ছিলেন ভাগ্যকুল রাজাদের ভাগ্নে। তিনি পূর্ববঙ্গের বণিক-সভার সভাপতিও ছিলেন। তখনকার দিনেই তিনি অন্তত দু কোটি টাকার মালিক। এখনকার সারা বাঙলাদেশময় ছিল তাঁর ব্যাবসা ছড়ানো।

আমার মহকুমা পুলিশ অফিসার, মদনমোহন লাল হুজার সঙ্গে আমার ১৯৪০-এর নভেম্বরে কৃষ্ণনগরে প্রথম আলাপ আর বন্ধুত্ব হয়। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলুম। তিনিও মনে করলেন কিছু খানাতল্লাসিতে ভবিষ্যতের জন্যে ফল ভালো হতে পারে। এবং এ বিষয়ে চুনোপুঁটি ছেড়ে রুইকাতলার পিছনে ধাওয়া করাই ভালো। ভারতরক্ষা আইন-বলে তখন যদি কারোকে গ্রেপ্তার করা যেত, কিছুকালের জন্যে তাকে জামিন অমঞ্জুর করে জেলে রাখা যেত। ফলে মজুতদারদের প্রাণে ভয় সঞ্চার করা সম্ভব হত। একদিন দুপুরের পর মুন্সীগঞ্জ থেকে দুটি পুলিশ অফিসার সঙ্গে করে মিরকাদিম গেলুম। যে কয়টি গুদাম দেখলুম প্রায় সবগুলিই খালি। অথচ তাদের আগে থেকে খবর পাবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পূর্বে কখনও এরকম হানা পড়ে নি যে তারা সাবধান হবে। সেদিন সকালেই হুজার সঙ্গে কথা বলে স্থির হয়েছে, সুতরাং মাল সরাবার সময়ও কেউ পায় নি। একটিমাত্র আড়ত পাওয়া গেল যেখানে প্রকাশ্য গুদামের এক কোণে ত্রিপলঢাকা একটি ছোটো চালের বস্তার ঢিবি দেখা গেল, তাও শ দুয়েক বস্তার কোনোমতেই বেশি নয়। গুদামের আয়তনের তুলনায় নস্যি বলা যায়। এটি বসন্ত মণ্ডলের গুদাম।

গ্রেপ্তার করা হল বসন্ত মণ্ডলকে, পরানো হল হাতকড়া, কোমরে বাঁধা হল দড়ি, সারা গঞ্জের লোকের সম্মুখ দিয়ে হাঁটিয়ে মুন্সীগঞ্জে নিয়ে পোরা হল জেলে। শুধু তাই নয়। তাঁর পরিবারের সব বন্দুক বাজেয়াপ্ত করে, তাদের লাইসেন্স সাময়িকভাবে রদ করা হল, যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হয়।

ঘটনাটির খবর রাতারাতি ছড়িয়ে পড়ল, এমনকী ঢাকা জেলার অন্যত্রও খবর গেল। কলকাতার সংবাদপত্রে গ্রেপ্তারের খবর বেরোল। আমার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জে. এল. লিউয়েলিন একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পাছে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে আমাকে ভর্ৎসনা করা হয়। তাঁর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণও ছিল। ভাগ্যকুল রাজারা গভর্নর, মুখ্যমন্ত্রী ও শ্যামাপ্রসাদের

কাছে নালিশ জানালেন, তাঁদের ভাগিনেয়কে ছেড়ে দিয়ে পরিবারের অস্ত্রশস্ত্র ফিরে পাবার আবেদন করলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে বসন্ত মণ্ডল ছাড়া পেলেন। তার মাস দুয়েক পরে, সাধারণ লোকের স্মৃতি যখন কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, তখন লিউয়েলিন আমাকে মণ্ডলের বন্দুকগুলি ফেরত দিতে লিখলেন (তখন ফোন ছিল না)। বললেন, এমন ভাষায় আদেশটি যেন লিখি যাতে মনে হয় আমি নিজের বিবেচনামতে ফেরত দিচ্ছি, সরকারের আদেশে নয়। চিঠির শেষে একটি বাক্য যোগ করলেন যা আমি আজীবন মনে রেখেছি : আইন এমনিতেই এত কড়া যে সেটিকে আরো বেশি কড়া বলে দেখানো নিষ্প্রয়োজন।

তবে এই ধরপাকড়ের সুফল আর যতদিন মুন্সীগঞ্জে ছিলুম ততদিন পেয়েছি। প্রথম সুফলটি হল, লোকের মনে বদ্ধমূল ধারণা হল আমি কড়া আর জেদি এবং চোরা-কারবারের বিরুদ্ধে, ফলে আমার সদিচ্ছা সম্বন্ধে গোড়া থেকে বিশ্বাস এল। দ্বিতীয়ত, ১৯৪২-এর প্রথম থেকে ১৯৪৩-এর অকটোবর পর্যন্ত যেখানেই আমি পায়ে হেঁটে বা সাইকেল চড়ে গুদাম দেখেছি তখনই স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা এসে আমাকে সাহায্য করেছেন। ধরা চাল লঙ্গরখানার কাজে বা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে স্থির-করা দরে বিলি করতে সাহায্য করেছেন। এইভাবে আমি বিক্রমপুরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত সাইকেলে করে ঘুরেছি, সঙ্গে থাকত আমার আর্দালি সামাদ কিংবা জলিল। দিনে গড়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল সাইকেলে ঘোরা হত। বসন্ত মণ্ডলের ব্যাপারটি আমাকে জনপ্রিয় করে তোলে, তার সঙ্গে লোকের বিশ্বাস হয় আমি পরিশ্রমে বিমুখ নই। সুতরাং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কোনো আশঙ্কা ছিল না। এই সময়ে আড়তে ঢুকে যেটুকু চাল দেখেছি, তার থেকে আড়তদারদের সমুখে হিসাব করে তার নিজস্ব প্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে বাকিটুকু একটুকরো কাগজে লিখে নাম সই, তারিখ আর রবার স্ট্যাম্পে এস-ডি-ওর সীলমোহর লাগিয়ে আদেশ জারি করেছি বাকি চাল, যতদিন পর্যন্ত আমি লিখিত আদেশে সে চাল না খালাস করি ততদিন রেখে দিতে। সে আদেশ সর্বদাই অক্ষরে-অক্ষরে পালিত হয়েছে। আদেশের ধানচাল হয়তো ইতিমধ্যে খারাপ হয়ে গেছে, তবুও আড়তদার ভয়ে সে চাল বদল করে নতুন চাল রেখে আমার কাছে খালাসের জন্য আবেদন করেছে, আমার হাতের পুরনো চিরকুট আবেদনের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে।

এই ধরনের তল্লাসির ব্যাপারে আমি স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন আর কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের ও রিলিফ কমিটির সভ্যদের কাছে যে অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি, এখন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। খুব কম ক্ষেত্রেই তাঁরা ভুল করে অথবা ব্যক্তিগত কিংবা স্থানীয় শত্রুতাবশে ঝুটো খবর দিয়েছেন। আসল কথা হচ্ছে, মজুত চাল অত্যন্ত কম ছিল। ফলে প্রথম কয়েক মাস ধরপাকড়ের পর এই পন্থাটি বিশেষ ফল-প্রসূ না হওয়ায় আমার নীতি বদলাতে হল। স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে মহাজনদের উপর হামলা করার পরিবর্তে, যেনতেনপ্রকারে চাল আমদানি করার জন্যে তাঁদের তোষামোদ করা, এবং আমদানি চাল তাঁরা কতখানি কী দরে কমিটিকে দিতে পারবেন, তার নিষ্পত্তি করা। বাকি চাল তাঁরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখার অথবা বাজারদরে ছাড়ার অনুমতি পেতেন। আমি বিশেষ আনন্দিত হই যখন, অপমান ভুলে গিয়ে বসন্ত মণ্ডল নিজে এ বিষয়ে এগিয়ে এলেন। ১৯৪৩ সালের মার্চ থেকে এইভাবে পরস্পরের মধ্যে কিছুটা আস্থা না গড়ে উঠলে আসল দুর্ভিক্ষ যখন এল তখন এবং তার পরে মুন্সীগঞ্জে যত লোক মারা যায় তার থেকে অনেক বেশি মারা যেত।

১৯৪২-এর ১৯শে নভেম্বর কলকাতায় আমার মেয়ের জন্ম হয়। তখন আমি কলকাতায়। ২২শে

নভেম্বর মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রখ্যাত রাধারমণ মিত্র কলকাতা থেকে আমার সঙ্গে মুন্সীগঞ্জে এলেন। যে কয়দিন আমার কাছে ছিলেন, আমরা দুজনে নৌকা করে তালতলা খাল বেয়ে লৌহজঙ্গ, লৌহজঙ্গ খাল বেয়ে শ্রীনগর যাই। শ্রীনগর থেকে ভাগ্যকুল গিয়ে তিনি স্টীমারে কলকাতা ফিরে যান। এই কয়দিন সারাক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করে তাঁর কাছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রথম যুগের অনেক কথা জানতে পারি আর শুনি গঙ্গাধর অধিকারী, অজয় ঘোষ, এস-জি সরদেশাই, সাজ্জাদ জহির প্রভৃতি নেতাদের গল্প; তদুপরি, রাধারমণবাবুর নিজের কারাগারের অভিজ্ঞতার কথা। আমার সৌভাগ্য তাঁর জন্মদিনে আমি প্রণাম জানিয়ে আসতাম।

১৯৪২-এর শেষ দু-মাসে চালের দাম মণ-পিছু আট থেকে বারো টাকার মধ্যে প্রায় স্থির ছিল। আউশ চাল বাজারে আসায়, আমন ধানে ভালো ফুল হওয়ায় মজুতদাররা বোধ হয় নতুন চালের আশায় ছিল। ডিসেমবরের শেষভাগে যখন কলকাতা গেলুম আমার স্ত্রী আর মেয়েকে আনতে, তখন দাম সামান্য চড়ছে।

কলকাতায় গিয়ে যখন দেখলুম ছিন্নবস্ত্রে, শীর্ণ-দেহে, কোলে-কাঁখে শিশু নিয়ে একহাতা ফ্যান চেয়ে দোরে-দোরে মেয়েরা ঘুরছে তখন স্বামী হিসাবে, এবং সদ্যোজাত মেয়ের পিতা হিসাবে আমার মনে খুব কষ্ট হয়। দুটি একটি মেয়েকে জিগ্যেস করে জানলুম—মেদিনীপুর আর ২৪-পরগনায় কী ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে গেছে। তবে তখনও মেদিনীপুর সাইক্লোনে আন্দাজ কত লোক মারা গেছে সে বিষয়ে ভালো খবর পাওয়া যায় নি। দুই জেলায় কী ধরনের অত্যাচার হয়েছে, ত্রাণকার্যে ইচ্ছা করে কত অবহেলা করা হয়েছে সে বিষয়ে সংবাদ তো দূরের কথা, কোনো ধারণা ছিল না—মাত্র একদিনে কত হাজার-হাজার স্ত্রীর বৈধব্যদশা হয় এবং সেই সঙ্গে কত শিশু অনাথ হয়ে যায়।

১৮৭৮-৭৯ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন রিপোর্টে কমিশনের সভ্য কেয়ার্ড ও বম্বের লাট রিচার্ড টেম্পলের মধ্যে যে প্রশ্নোত্তর হয় তার একাংশ এইরকম :

কেয়ার্ড : আপনি কি উদ্দেশ্যহীনভাবে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোকে বিপদের চিহ্ন হিসাবে দেখেন? এই ধরনের ঘোরাফেরা বন্ধ করা কি সম্ভব? যদি সম্ভব হয়, তবে কীভাবে সম্ভব একটু বলবেন!

রিচার্ড টেম্পল্ : হাঁ, নিশ্চয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে যেসব বিপদের লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে এই ধরনের ঘোরাফেরাকে আমি সমূহ বিপদের চিহ্ন বলে মনে করি। এটি দেখা গেলেই বিপদ অনিবার্য ও ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে ধরে নিতে হবে। ব্যাপক মৃত্যু-সম্ভাবনার আগাম সঙ্কেত। এই ধরনের এলোমেলো ঘোরাফেরা যত মৃত্যুর কারণ হয়, অন্য কোনো কারণ তার ধারেকাছে যেতে পারে কিনা সন্দেহ। সাধু, পেশাদার ভিখারি বা ভবঘুরের কথা অবশ্য আলাদা। এই ধরনের ঘোরাফেরার সব থেকে ভালো ওষুধ হচ্ছে গ্রামে-গ্রামে যথাসম্ভব ত্রাণকার্য শুরু করে দেওয়া। যদি গ্রামে-গ্রামে এই ত্রাণকাজ আগে থেকে, তাড়াতাড়ি, সুষ্ঠুভাবে শুরু করতে পারা যায় তাহলে এই জাতীয় ঘোরাফেরা বন্ধ হয়ে যায়।

পূর্বের অধিকাংশ দুর্ভিক্ষের বছরে, মেয়েরা শিশুরা ঘরে থাকত, পুরুষরাই ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে আনত, আর পরিশ্রমে ও অপুষ্টির ফলে তারা প্রাণ হারাত। মুন্সীগঞ্জে দেখেছি এই ধরনের ভিক্ষার খোঁজে উদ্দেশ্যহীন ঘোরাফেরা বা নৌকা বাওয়ার ফলে অতি দ্রুত মৃত্যু আসত। আমি অন্তত দুশ জন মুসলমান বা নমঃশূদ্র মাঝির কথা জানি যারা অনাহারে জীর্ণ হয়ে নৌকা বাইতে-বাইতে নিঃশেষ

হয়ে জলে টপ করে পড়ে গেছে। আগের-আগের দুর্ভিক্ষে মেয়ে বা শিশুদের থেকে পুরুষরা বেশি সংখ্যায় মারা যেত বলে অনেক কমিশনের সাক্ষীরা বলতেন যে মেয়েরা রান্নার ভার নিত বলে হয়তো লুকিয়ে পুরুষদের থেকে একটু বেশি খেত। কিন্তু মুন্সীগঞ্জের দুর্ভিক্ষে আমার অভিজ্ঞতায় কখনও মনে পড়ে না, এমনকী লঙ্গরখানার খাওয়াতেও নয় যে, খিদের তাড়না যদিও মানুষকে যথেষ্ট অমানুষ করে দেয়, তবু মেয়েরা তাদের ছেলেদের বা পুরুষদের অংশে ভাগ বসিয়েছে। বরং তারা চিরাচরিত সংস্কারবশে ছেলেমেয়েদের, স্বামীদের বেশি খেতে দিয়েছে। সুতরাং ১৯৪৩-এ, বিশেষ করে কলকাতায়, পুরুষদের থেকে মেয়েদের যে বেশি মৃত্যু হয়েছিল, তার কারণ এ নয় যে মেয়েরা পুরুষদের থেকে কম খেতে পেত। উপরন্ত আইনের বরাদ্দ রেশন বলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কিছু ছিল না। উলটে চালের দাম এত আকাশচুম্বী হয়েছিল যে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছিল। যদিই বা রেশনিং থাকত তাহলেও পাঁচ বা ছয় গুণ দামে কেনার সামর্থ্য খুব কম পরিবারের ছিল।

আমার নিজের পরিবারের কথা বললেই আসল অবস্থার কিছুটা বোঝা যাবে। ১৯৪২ সালের বড়ো-দিনের সপ্তাহে স্ত্রী-কন্যাকে ফেলে মুন্সীগঞ্জে ফিরে যাই। তখনই স্থানীয় বন্ধু ম্যাকার্টিচ নিজে থেকে এক বন্দোবস্ত করেন, যার কল্যাণে আমি সপরিবারে কোনোমতে বেঁচে যাই। ম্যাকার্টিচের নিজস্ব পাটের ব্যাবসা ছিল এবং সেই কারণে পাটের নৌকা ছিল। নিজের চালের সঙ্গে তিনি আমার পরিবারের প্রয়োজন-মতো চাল ফরিদপুর থেকে আনিয়ে নিজের গুদামে রেখে দেন। সে চালের দর পড়ে মণপিছু বারো থেকে ষোলো টাকা। আয়কর ইত্যাদি সরকারকে অবশ্য দেয় টাকা বাদ দিয়ে ঘরে আনার মতো মাহিনা আমার দাঁড়াত পাঁচশ টাকা। মুন্সীগঞ্জে শতকরা দশটি পরিবারেও এই আয় ছিল না। উপরন্ত মুন্সীগঞ্জে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। পদমর্যাদার দরুন ছুট করে আমার বাড়িতে এসে কেউ সহসা খেতে চাইবে বা সাহায্য চাইবে এও সম্ভব ছিল না। আমরা ছিলুম তিন প্রাণী, এবং পরিচর্যার জন্য ছিল বাবুর্চি লোকনাথ, বেয়ারা মোজাফর, রহিম মালী, মেয়ের আয়া ঠাকুরদাসী, তার ছোটো মেয়ে সুহাসী। আমাদের পরিবারে এই ছিল নিত্য খাইয়ে। ক্রমে, আমাদের যা জমানো চাল থাকত তার থেকে কিছু-কিছু ভাগ পেত আমার দুই চাপরাশি সামাদ আর জলিল, এবং আমার স্টেনো হুসেন। জুলাই মাসে দু-বেলা আরো খাবার লোক হল পাখাটানা ছেলে সোহরাব, তার বাচ্চা ভাই শফি। শেষে, তার নিজের ব্যাবসা খুইয়ে এল আমাদের বাড়িতে যে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করত, রাখাল, তার স্ত্রী সুশীলা আর মেয়ে রেণু। আমাদের পরিবারে আসার আগে রাখালের যা-কিছু বাসনপত্র, যন্ত্রপাতি ছিল, বেচে আর যখন কুলোল না, তখন তারা আমার সংসারে এল। তার পর এল একটি ছেলে রফি। তার বাবা ছিলেন মাঝি, নৌকা বাইতে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে জলে পড়ে মারা যান। ম্যাকার্টিচ নিলেন তার ভার, আমি তার পড়াশোনার খরচের। আমাদের ভাগ্য-ক্রমে সে এখনও খিতিরপাড়ার পয়সাগ্রাম থেকে চিঠি লেখে। প্রায়ই লেখে সে যদি পারত তার গায়ের চামড়া দিয়ে আমার জুতো বানিয়ে দিত। এই ধরনের কথা আমার অকিঞ্চিৎ জীবনের পরম পুরস্কার বলে মনে করি। এতগুলি ব্যক্তিগত কথা লিখলুম এই কারণে যে, এই যদি আমার অবস্থা হয়ে থাকে, তবে সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থঘরে, বিশেষত যাঁদের আগে থাকতে অল্প দরে চাল পাবার ব্যবস্থা ছিল না, তাঁদের কী দুরবস্থা হয়েছিল তা শুধু কল্পনাই করা যায়। ভেবে দেখুন, এতগুলি লোকের মুখে, আমার অবস্থার লোক আশি-নব্বই টাকা দরে চাল কিনে, ভাত দিতে পারত!

তবে, আমার এক বিষয়ে সবথেকে বেশি যে কষ্ট

হত, সেটা বিবেকের। আমার কথা শুনে পাঠক হয়তো ভাববেন, আমি মহৎ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে রাখবেন আমার তখন বয়স পঁচিশ, মনের অজ্ঞতা আমার নিশ্চয় এখনকার থেকে বেশি ছিল, তার সঙ্গে বিবেকও। যখন শত-শত শিশু অনাহারে মারা যাচ্ছে তখন আমরা আমাদের শিশুকন্যা যাতে ঠিক-মতো বাড়ে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য আমাদের দু জন বিচক্ষণ ডাক্তার বন্ধু, মন্মথনাথ নন্দী ও শৈলেন দাশের উপদেশে যথাসম্ভব সহজ-প্রাপ্য সস্তা সবজি ও সাদামাটা অথচ পুষ্টিকর খাবার তাকে দিতুম। যাদের সেবায় নিযুক্ত, তাদের থেকে নিজে ভালো অবস্থায় থাকার জন্যে মনে-মনে যে অপরাধবোধে আমি তখন অহরহ ভুগেছি, ভাগ্যক্রমে ঠিক সে ধরনের অপরাধবোধ উত্তরজীবনে আমার আর হয় নি। অবশ্য মানুষ নিজের বিবেককে স্তোক দেবার জন্যে বহু রকম ফন্দি ও অজুহাত খুঁজে বার করে।

১৯৪২-এর শেষে আউশ ধানের মজুত ফুরিয়ে গেল। ১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষার্ধ থেকে ধান-চালের দাম আবার বাড়তে শুরু করল। সেই সময় থেকে পনেরো দিন অন্তর আমাদের যে গোপনীয় রিপোর্ট দিতে হত তাতে এবং ফেবরুয়ারি থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ধানচাল চেয়ে আমি যে টেলিগ্রাম পাঠাতুম তার কোনো ফলই ফলে নি। তবে এইসব লেখা আর টেলিগ্রাম পরে প্রমাণ করে কী ধরনের অবস্থা ঘনিয়ে উঠছিল, এবং সে বিষয়ে আমি বরাবর সরকারকে জানিয়ে গেছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অশোক মিত্রের জন্ম ১৯১৭ সালে। পড়াশুনা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অক্সফোর্ডে। ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান ১৯৩৯ সালে। এই পরিষেবায় তিনি জাতীয় স্তরে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত। অধ্যাপনা করেছেন জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি এবং ইনডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ইংরাজি এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই অশোক মিত্রের লিপিকুশলতা সর্বজনবিদিত। তাঁর কৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। জনসংখ্যাতত্ত্ব, শিল্পকলার ইতিহাস, বাঙলা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমিত্রের গভীর-অনুশীলনজাত লেখাগুলি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার এবং বোধের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষ দিন

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

দরজা খুলে প্রতীপ দেখল দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছে দাঁতে নবীন সরখেল।

একটু-একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। শেষ রাতে চাদর বা কাঁথা গায়ে দিতে হয়। অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে গেলেও উঠতে ইচ্ছে করে না। আলসেমি। তবু না উঠেও উপায় নেই। সব কাজ সেরে সময়ে আফসে পৌঁছতে হলে সকাল ছটার মধ্যে উঠে পড়তেই হয়। মাথার কাছে চা রেখে সুচরিতা চুল টেনে বা পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তুলে দেয়। আজ অবশ্য দেয় নি। আজ প্রতীপ বিছানা ছেড়েছে বেশ দেরিতে। একটু অলসতার দাবি যেন গ্রাহ্য আজ। বাজার করা নেই, মেয়ের পড়া দেখানো নেই। অফিসেও ঘণ্টা-দুই পরে যাবার ইচ্ছে আজ। সেরকম খবর দেওয়া আছে। রাখা হয়েছে একটা বাড়তি কাগজ। নিয়মবহির্ভূত দ্বিতীয় কাপ চা নিয়ে প্রতীপ তখন সেই কাগজটা পড়ছিল। নিছক গাল-গল্প, তাও মন্দ লাগছিল না।

নবীন সরখেলকে চেনে না—এমন লোক এ শহরে কম। চেহারা দেখে ভক্তি হয় না। রোগা, ছোটোখাটো চেহারা, বয়স বোঝা যায় না। হতে পারে পঁয়তাল্লিশ কি পঁয়ত্রিশ। পরনে ধুতি, খদ্দরের পানজাবি—ইস্ত্রি-করা নয়, তবে ধবধবে পরিষ্কার। গলায় মাফলার, গায়ে একটা হালকা চাদর। না-আঁচড়ানো লম্বা চুল, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। প্রতীপের ব্যাঙ্কের সামনে নবীন সরখেলের চা-পানের ছোটো দোকান। পাশাপাশি খানতিনেক সরকারি অফিস, সাত-আটখানা দোকান, বড়ো রাস্তার মোড়। কী-বা এমন বিক্রি-বাটা। দুটো লোক কাজ করে। তারাই অবশ্য দোকানটা চালায়। নবীনকে দোকানে পাওয়া ভার। যেটুকু সময় থাকে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে খুব আড্ডা জমায়। চা সে খায় তবে নেশা নেই, আর পান-বিড়ি একেবারেই চলে না। যারা আড্ডা দিতে আসে তারা গাঁটের কড়ি খসিয়ে চা খায়, পান-বিড়ি খায়। নবীনের লোকদুটো ভীষণ কড়া, মালিকের

বন্ধু হলেও খাতির করে না।

কেউ-কেউ বলে বেটা যে চালিয়াত তা ওর ব্যবসা চালানোর কায়দাতেই বোঝা যায়। যারা নবীনের নিন্দে করে, তারা তা করে নবীনের আড়ালে। নবীন সরখেল নেতা না, গুণ্ডা-সর্দার না, অফিসার না। নবীন সরখেল পরোপকারী। লোকের বিপদে-আপদে, আনন্দে-উৎসবে নবীন একবার খবর পেলেই হল—তাকে ডাকতে হয় না। শ্মশানে, হাসপাতালে, খেলার মাঠে, যাত্রাগানের আসরে—সর্বত্র লোকটা থাকে। একটা ছোটো শহরে এমন মানুষরা বড়ো বেশি দরকারি। তাই নবীন সরখেলকে চেনে সবাই।

এহেন মানুষকে সকালবেলা নিজের দরজায় দেখেও খুশি হয় না প্রতাপ। তার তো আজ কোনো সমস্যা নেই, সে নবীনের সাহায্য চায় না। সে জানে সুচরিতা পছন্দ করে না নবীনকে। পরোপকারী হলে কী হয়, লোকটার বহু দোষ। সুচরিতা বলে, লোকটা বড়ো গায়ে-পড়া আর মেয়েলি স্বভাবের। রাজ্যের হাঁড়ির খবর রাখে সে, আর গল্পো করে ইনিয়ে-বিনিয়ে। তার আরও দোষ—বড়ো দোষ, সে খুব ধার চায়। হেন লোক নেই যার কাছে সে হাত পাতে নি। তবে সে যে কারও টাকা মেরে দিয়েছে, কখনও এমন শোনা যায় নি। সময়ের হেরফের ঘটে।

—কিন্তু, তাই বা হবে কেন, যার কথার দাম নেই সে ভালো লোক হয় কেমন করে?

প্রতাপ ব্যস্ত মানুষ। ব্যাঙ্ক সরকারি প্রতিষ্ঠান যদিও, তবু সেখানে কাজের চাপ খুব বেশি। ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ফাঁকি সে দিতেও চায় না। কাজ করতে তার ভালোই লাগে। বাড়িতেও যতক্ষণ থাকে সে কাজ নিয়েই থাকে। তবে ব্যাঙ্কের জগতের বাইরে যে কাজ সেসব কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। একবার ধরিয়ে দিলে, একটু দেখিয়ে দিলে সে চমৎকার ধরে নেয়। মাথাটা প্রতাপের পরিষ্কার, তবে বিচার-বিশ্লেষণ তার স্বভাবে নেই। যেমন, নবীনকে তো তার বেশ ভালোই লাগত। সুচরিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পর নবীনের সব কটা দোষ প্রতাপ বেশ স্পষ্ট দেখতে পায়। নবীন পরোপকারী কিন্তু বড়ো বেশি তার আমিত্বের বড়াই আর ঢাক-পেটানো স্বভাব। তাকে প্রতাপ আর পছন্দ করে না, এড়িয়ে চলে। নবীনও তা বোঝে হয়তো। ঠেকায় না পড়লে সে আজকাল আর প্রতাপের কাছে আসে না, বাড়িতে তো নয়ই।

নবীন আজ এল বহুদিন পর।

—বলো নবীন, খবর কী, কী মনে করে এই অসময়ে?

অন্যদিন এ সময় নবীনকে বসতেও বলা হত কিনা সন্দেহ। সত্যিই অসময়। নটা বেজে গেছে। মেয়ে খেতে বসেছে, তার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। অন্যদিন এ সময় প্রতাপ স্নানে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। এ সময় দম নেবার সময় থাকে না সুচরিতারও। কাজের মেয়ে বা গ্যাসের লোক ছাড়া এ সময় আর কেউ আসুক—তা একেবারেই চায় না সুচরিতা। তবু প্রতাপ আজ হাসিমুখে নবীনকে ডেকে ঘরে বসায়। আজ যে বিশেষ দিন।

আজ প্রতাপ-সুচরিতার বিবাহবার্ষিকী।

প্রতাপদের সংসারে চারটে বিশেষ দিন—প্রতাপ, সুচরিতা আর বিস্তর জন্মদিন এবং প্রতাপ-সুচরিতার বিয়ের দিন। বাকি দিনগুলি যেমন তেমন, এই চারটে দিন তাদের কাটে আনন্দ-উল্লাসে। একে অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করে তারা, উপহার কেনে। এই চারটে দিন তারা কাছে-পিঠে বেড়াতে যায় অথবা একলো বাড়িতে বসে চর্ব-চোষ্য খায়, অন্যবেলা বাইরে। বিশেষ দিনে কোনো কৃপণতা নেই, তর্ক-ঝগড়া মান-অভিমানের নিয়ম নেই। সংসার চালায় সুচরিতা। সে নিয়মে থাকতে ভালোবাসে, সবকিছু তার নিয়মে বাঁধা। সারা বছর সংসার সে চালায় টিপে-টিপে, এই চারটে দিন উদারহস্ত। নিয়মে থাকতে যে মাঝে-মাঝে হাঁপ ধরে না তা নয়, তবে সীমিত সামর্থ্যে নিয়মে থাকাই যে ভালো তা তারা সকলেই বোঝে।

কাল অনেক আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার আর বাইরে যাওয়া নয়। কাল ছিল ছুটির দিন। প্রচুর টাকা আর মস্ত ফর্দ নিয়ে বাজারে গিয়েছিল প্রতাপ। বাজার করেছে মনের আনন্দে। আজ কোন্ ভোর থেকে সুচরিতা রান্না শুরু করেছে।

প্রতাপ একবার ভাবল নবীনের আগমনবার্তাটা সুচরিতাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। পরমুহূর্তে ভাবল, কী দরকার। নবীন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি সংবাদ দিতে এসেছে। তার কথাটা শুনে তাকে চটপট বিদায় করে দিলেই তো হল।

—শুনলাম আজ ব্যাঙ্কে যেতে দেরি হবে, কী ব্যাপার?

প্রতাপ বলল, বিশেষ কোনো ব্যাপার না, এমনি। তোমার কী খবর বলো।

নবীন উত্তর না দিয়ে গলায় ঝোলানো লম্বা মাফলারের এক প্রান্ত তুলে নিয়ে মুখ মুছল। চারপাশটা দেখল। মাঝারি মাপের বসার ঘর যার প্রায় অর্ধেক জুড়ে সোফাসেট, দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রিনট, কাঠের ব্রাকেটে কিছু পুতুল আর খেলনা, জানালায় মানিপ্ল্যান্ট, টবে ঘরের কোণে ক্যাকটাস। ঘরটা তবু বেশ নোংরাই হয়ে আছে। এখানে ওখানে ঝুল, ফ্যানের ব্লেডে ধুলোর পুরু আস্তরণ, আলমারিতে বই-কাগজপত্র এলোমেলো।

প্রতাপ দেখল নবীনের চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। মুখে তার সেই মোহন হাসিও নেই। যতই বনের মোষ তাড়াক বা দুনিয়া চষে বেড়াক, বয়স তো বাড়ছে। কিন্তু যে নবীন সর্বদা বেশি কথা বলে সে এমন চুপ করে বসে আছে কেন? কথার জবাবও দেয় না। প্রতাপ বিস্মিত হল।

—কী হল তোমার, নবীন? এত শুকনো দেখাচ্ছে! শরীর খারাপ?

—না স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে শরীর আমার ঠিক আছে।

—বেশ। তা বলো খবরটবর। বাড়িতে কিছু কাজ আছে, এক জায়গায় যেতেও হবে। সেজন্য একটু তাড়া আছে।

—আমারও খুব তাড়া, স্যার। যেন হঠাৎ ঘোর কাটল নবীনের। সোজা হয়ে বসল সে। মাফলারের ঝুলে-থাকা এক প্রান্ত ছুঁড়ে ফেলল পিঠের ওপর।

—খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, স্যার। আমার দোকানের সুবোধকে তো চেনেন। ব্যাঙ্কে যায় চা নিয়ে। তার মেয়েটাকে আমিই জোর করে ভরতি করিয়েছিলাম স্কুলে। ক্লাস সেভেনে পড়ে এখন। প্রাইভেট টিউটরও আমি জুটিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ চটপটে স্মার্ট মেয়ে। দেখলে মনেই হবে না সুবোধের মেয়ে। সেই মেয়েটা, স্যার, কাল সন্ধ্যায় একটা অ্যাকসিডেনটে—

চা হাতে ঘরে ঢুকছিল সুচরিতা। আজ বিশেষ দিন, তাই হয়তো নবীনের জন্যও চা। 'অ্যাকসিডেনট' শব্দটা শুনে থমকে দাঁড়াল সুচরিতা। আর সুচরিতাকে দেখে অথবা চায়ের কাপ হাতে সুচরিতাকে দেখে অ্যাকসিডেনটের মতো একটা মারাত্মক শব্দযুক্ত বাক্যও সম্পূর্ণ না করে নবীন থেমে গেল।

অ্যাকসিডেনট শব্দটাই দমকলের ঘণ্টার মতো বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অন্তত প্রতাপের কাছে। তার বুকের ভিতর সহসা ঢাক বেজে ওঠে। সে কাতর হয়ে পড়ে।

—আ, তুমি থামলে কেন নবীন, বলো। কেমন করে হল, কেমন আছে সুবোধের মেয়ে? জোর তাড়া দেয় প্রতাপ।

সুচরিতা শুধু সুগৃহিণী নয়, সুন্দরীও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে সে কিছুটা লম্বা—পাঁচফুট পাঁচ। সামান্য মোটা কিন্তু লম্বা বলেই তা কারো-কারো চোখে আরও মানানসই। দীর্ঘ ভ্রূপল্লবের ছায়ায় স্নিগ্ধ সজল চোখ। একটু হয়তো বা শীতল। প্রসাধনের বাহুল্য নেই, কিন্তু

হত, সেটা বিবেকের। আমার কথা শুনে পাঠক হয়তো ভাববেন, আমি মহৎ হবার চেষ্টা করছি। কিন্তু মনে রাখবেন আমার তখন বয়স পঁচিশ, মনের অজ্ঞতা আমার নিশ্চয় এখনকার থেকে বেশি ছিল, তার সঙ্গে বিবেকও। যখন শত-শত শিশু অনাহারে মারা যাচ্ছে তখন আমরা আমাদের শিশুকন্যা যাতে ঠিক-মতো বাড়ে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য আমাদের দু জন বিচক্ষণ ডাক্তার বন্ধু, মন্মথনাথ নন্দী ও শৈলেন দাশের উপদেশে যথাসম্ভব সহজ-প্রাপ্য সস্তা সবজি ও সাদামাটা অথচ পুষ্টিকর খাবার তাকে দিতুম। যাদের সেবায় নিযুক্ত, তাদের থেকে নিজে ভালো অবস্থায় থাকার জন্যে মনে-মনে যে অপরাধবোধে আমি তখন অহরহ ভুগেছি, ভাগ্যক্রমে ঠিক সে ধরনের অপরাধবোধ উত্তরজীবনে আমার আর হয় নি। অবশ্য মানুষ নিজের বিবেককে স্তোক দেবার জন্যে বহু রকম ফন্দি ও অজুহাত খুঁজে বার করে।

১৯৪২-এর শেষে আউশ ধানের মজুত ফুরিয়ে গেল। ১৯৪৩-এর জানুয়ারির শেষার্ধ থেকে ধান-চালের দাম আবার বাড়তে শুরু করল। সেই সময় থেকে পনেরো দিন অন্তর আমাদের যে গোপনীয় রিপোর্ট দিতে হত তাতে এবং ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ধানচাল চেয়ে আমি যে টেলিগ্রাম পাঠাতুম তার কোনো ফলই ফলে নি। তবে এইসব লেখা আর টেলিগ্রাম পরে প্রমাণ করে কী ধরনের অবস্থা ঘনিয়ে উঠছিল, এবং সে বিষয়ে আমি বরাবর সরকারকে জানিয়ে গেছি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অশোক মিত্রের জন্ম ১৯১৭ সালে। পড়াশুনা কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং অক্সফোর্ডে। ইনডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান ১৯৩৯ সালে। এই পরিষেবায় তিনি জাতীয় স্তরে একজন প্রথিতযশা ব্যক্তি। শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি দেশ-বিদেশে ব্যাপ্ত। অধ্যাপনা করেছেন জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি এবং ইনডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। ইংরাজি এবং বাঙলা উভয় ভাষাতেই অশোক মিত্রের লিপিকুশলতা সর্বজনবিদিত। তাঁর কৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। জনসংখ্যাতত্ত্ব, শিল্পকলার ইতিহাস, বাঙলা সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে শ্রীমিত্রের গভীর-অনুশীলনজাত লেখাগুলি আমাদের জ্ঞানভাণ্ডার এবং বোধের জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিশেষ দিন

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

দরজা খুলে প্রতাপ দেখল দাঁড়িয়ে নখ খুঁটছে দাঁতে নবীন সরখেল।

একটু-একটু শীত পড়তে শুরু করেছে। শেষ রাতে চাদর বা কাঁথা গায়ে দিতে হয়। অভ্যাসবশত ঘুম ভেঙে গেলেও উঠতে ইচ্ছে করে না। আলসেমি। তবু না উঠেও উপায় নেই। সব কাজ সেরে সময়ে আফসে পৌঁছতে হলে সকাল ছটার মধ্যে উঠে পড়তেই হয়। মাথার কাছে চা রেখে সুচরিতা চুল টেনে বা পায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তুলে দেয়। আজ অবশ্য দেয় নি। আজ প্রতাপ বিছানা ছেড়েছে বেশ দেরিতে। একটু অলসতার দাবি যেন গ্রাহ্য আজ। বাজার করা নেই, মেয়ের পড়া দেখানো নেই। অফিসেও ঘণ্টা-দুই পরে যাবার ইচ্ছে আজ। সেরকম খবর দেওয়া আছে। রাখা হয়েছে একটা বাড়তি কাগজ। নিয়মবহির্ভূত দ্বিতীয় কাপ চা নিয়ে প্রতাপ তখন সেই কাগজটা পড়ছিল। নিছক গাল-গল্প, তাও মন্দ লাগছিল না।

নবীন সরখেলকে চেনে না—এমন লোক এ শহরে কম। চেহারা দেখে ভক্তি হয় না। রোগা, ছোটোখাটো চেহারা, বয়স বোঝা যায় না। হতে পারে পঁয়তাল্লিশ কি পঁয়ত্রিশ। পরনে ধুতি, খদ্দরের পানজাবি—ইস্ত্রি-করা নয়, তবে ধবধবে পরিষ্কার। গলায় মাফলার, গায়ে একটা হালকা চাদর। না-আঁচড়ানো লম্বা চুল, কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ। প্রতাপের ব্যাঙ্কের সামনে নবীন সরখেলের চা-পানের ছোটো দোকান। পাশাপাশি থানাতিনেক সরকারি অফিস, সাত-আটখানা দোকান, বড়ো রাস্তার মোড়। কী-বা এমন বিক্রি-বাটা। দুটো লোক কাজ করে। তারাই অবশ্য দোকানটা চালায়। নবীনকে দোকানে পাওয়া ভার। যেটুকু সময় থাকে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে খুব আড্ডা জমায়। চা সে খায় তবে নেশা নেই, আর পান-বিড়ি একেবারেই চলে না। যারা আড্ডা দিতে আসে তারা গাঁটের কড়ি খসিয়ে চা খায়, পান-বিড়ি খায়। নবীনের লোকদুটো ভীষণ কড়া, মালিকের

বন্ধু হলেও খাতির করে না।

কেউ-কেউ বলে বেটা যে চালিয়াত তা ওর ব্যবসা চালানোর কায়দাতেই বোঝা যায়। যারা নবীনের নিন্দে করে, তারা তা করে নবীনের আড়ালে। নবীন সরখেল নেতা না, গুণ্ডা-সর্দার না, অফিসার না। নবীন সরখেল পরোপকারী। লোকের বিপদে-আপদে, আনন্দে-উৎসবে নবীন একবার খবর পেলেই হল—তাকে ডাকতে হয় না। শ্মশানে, হাসপাতালে, খেলার মাঠে, যাত্রাগানের আসরে—সর্বত্র লোকটা থাকে। একটা ছোটো শহরে এমন মানুষরা বড়ো বেশি দরকারি। তাই নবীন সরখেলকে চেনে সবাই।

এহেন মানুষকে সকালবেলা নিজের দরজায় দেখেও খুশি হয় না প্রতীপ। তার তো আজ কোনো সমস্যা নেই, সে নবীনের সাহায্য চায় না। সে জানে সুচরিতা পছন্দ করে না নবীনকে। পরোপকারী হলে কী হয়, লোকটার বহু দোষ। সুচরিতা বলে, লোকটা বড়ো গায়ে-পড়া আর মেয়েলি স্বভাবের। রাজ্যের হাঁড়ির খবর রাখে সে, আর গপ্পো করে ইনিয়ে-বিনিয়ে। তার আরও দোষ—বড়ো দোষ, সে খুব ধার চায়। হেন লোক নেই যার কাছে সে হাত পাতে নি। তবে সে যে কারও টাকা মেরে দিয়েছে, কখনও এমন শোনা যায় নি। সময়ের হেরফের ঘটে।

—কিন্তু, তাই বা হবে কেন, যার কথার দাম নেই সে ভালো লোক হয় কেমন করে?

প্রতীপ ব্যস্ত মানুষ। ব্যাঙ্ক সরকারি প্রতিষ্ঠান যদিও, তবু সেখানে কাজের চাপ খুব বেশি। ফাঁকি দেবার উপায় নেই। ফাঁকি সে দিতেও চায় না। কাজ করতে তার ভালোই লাগে। বাড়িতেও যতক্ষণ থাকে সে কাজ নিয়েই থাকে। তবে ব্যাঙ্কের জগতের বাইরে যে কাজ সেসব কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিতে হয়। একবার ধরিয়ে দিলে, একটু দেখিয়ে দিলে সে চমৎকার ধরে নেয়। মাথাটা প্রতীপের পরিষ্কার, তবে বিচার-বিশ্লেষণ তার স্বভাবে নেই। যেমন, নবীনকে তো তার বেশ ভালোই লাগত। সুচরিতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পর নবীনের সব কটা দোষ প্রতীপ বেশ স্পষ্ট দেখতে পায়। নবীন পরোপকারী কিন্তু বড়ো বেশি তার আমিত্বের বড়াই আর ঢাক-পেটানো স্বভাব। তাকে প্রতীপ আর পছন্দ করে না, এড়িয়ে চলে। নবীনও তা বোঝে হয়তো। ঠেকায় না পড়লে সে আজকাল আর প্রতীপের কাছে আসে না, বাড়িতে তো নয়ই।

নবীন আজ এল বহুদিন পর।

—বলো নবীন, খবর কী, কী মনে করে এই অসময়ে?

অন্যদিন এ সময় নবীনকে বসতেও বলা হত কিনা সন্দেহ। সত্যিই অসময়। নটা বেজে গেছে। মেয়ে খেতে বসেছে, তার স্কুলে যাবার সময় হয়েছে। অন্যদিন এ সময় প্রতীপ স্নানে ঢুকছে বা বেরোচ্ছে। এ সময় দম নেবার সময় থাকে না সুচরিতারও। কাজের মেয়ে বা গ্যাসের লোক ছাড়া এ সময় আর কেউ আসুক—তা একেবারেই চায় না সুচরিতা। তবু প্রতীপ আজ হাসিমুখে নবীনকে ডেকে ঘরে বসায়। আজ যে বিশেষ দিন।

আজ প্রতীপ-সুচরিতার বিবাহবার্ষিকী।

প্রতীপদের সংসারে চারটে বিশেষ দিন—প্রতীপ, সুচরিতা আর বিন্তির জন্মদিন এবং প্রতীপ-সুচরিতার বিয়ের দিন। বাকি দিনগুলি যেমন তেমন, এই চারটে দিন তাদের কাটে আনন্দ-উল্লাসে। একে অন্যকে খুশি করার চেষ্টা করে তারা, উপহার কেনে। এই চারটে দিন তারা কাছে-পিঠে বেড়াতে যায় অথবা একেবেলা বাড়িতে বসে চর্ব-চোষ্য খায়, অন্যবেলা বাইরে। বিশেষ দিনে কোনো কৃপণতা নেই, তর্ক-ঝগড়া মান-অভিমানের নিয়ম নেই। সংসার চালায় সুচরিতা। সে নিয়মে থাকতে ভালোবাসে, সবকিছু তার নিয়মে বাঁধা। সারা বছর সংসার সে চালায় টিপে-টিপে, এই চারটে দিন উদারহস্ত। নিয়মে থাকতে যে মাঝে-মাঝে হাঁপ ধরে

না তা নয়, তবে সীমিত সামর্থ্যে নিয়মে থাকাই যে ভালো তা তারা সকলেই বোঝে।

কাল অনেক আলোচনার শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে এবার আর বাইরে যাওয়া নয়। কাল ছিল ছুটির দিন। প্রচুর টাকা আর মস্ত ফর্দ নিয়ে বাজারে গিয়েছিল প্রতীপ। বাজার করেছে মনের আনন্দে। আজ কোন্ ভোর থেকে সুচরিতা রান্না শুরু করেছে।

প্রতীপ একবার ভাবল নবীনের আগমনবার্তাটা সুচরিতাকে পৌঁছে দিয়ে আসে। পরমুহূর্তে ভাবল, কী দরকার। নবীন নিশ্চয়ই কোনো জরুরি সংবাদ দিতে এসেছে। তার কথাটা শুনে তাকে চটপট বিদায় করে দিলেই তো হল।

—শুনলাম আজ ব্যাঙ্কে যেতে দেরি হবে, কী ব্যাপার?

প্রতীপ বলল, বিশেষ কোনো ব্যাপার না, এমনি। তোমার কী খবর বলো।

নবীন উত্তর না দিয়ে গলায় ঝোলানো লম্বা মাফলারের এক প্রান্ত তুলে নিয়ে মুখ মুছল। চারপাশটা দেখল। মাঝারি মাপের বসার ঘর যার প্রায় অর্ধেক জুড়ে সোফাসেট, দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রিন্ট, কাঠের ব্রাকেটে কিছু পুতুল আর খেলনা, জানালায় মানিপ্ল্যান্ট, টবে ঘরের কোণে ক্যাকটাস। ঘরটা তবু বেশ নোংরাই হয়ে আছে। এখানে ওখানে ঝুল, ফ্যানের ব্লেডে ধুলোর পুরু আস্তরণ, আলমারিতে বই-কাগজপত্র এলোমেলো।

প্রতীপ দেখল নবীনের চোখে-মুখে ক্লান্তির ছাপ। মুখে তার সেই মোহন হাসিও নেই। যতই বনের মোষ তাড়াক বা দুনিয়া চষে বেড়াক, বয়স তো বাড়ছে। কিন্তু যে নবীন সর্বদা বেশি কথা বলে সে এমন চুপ করে বসে আছে কেন? কথার জবাবও দেয় না। প্রতীপ বিস্মিত হল।

—কী হল তোমার, নবীন? এত শুকনো দেখাচ্ছে! শরীর খারাপ?

—না স্যার, আপনাদের আশীর্বাদে শরীর আমার ঠিক আছে।

—বেশ। তা বলো খবরটবর। বাড়িতে কিছু কাজ আছে, এক জায়গায় যেতেও হবে। সেজন্য একটু তাড়া আছে।

—আমারও খুব তাড়া, স্যার। যেন হঠাৎ ঘোর কাটল নবীনের। সোজা হয়ে বসল সে। মাফলারের ঝুলে-থাকা এক প্রান্ত ছুঁড়ে ফেলল পিঠের ওপর।

—খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, স্যার। আমার দোকানের সুবোধকে তো চেনেন। ব্যাঙ্কে যায় চা নিয়ে। তার মেয়েটাকে আমিই জোর করে ভরতি করিয়েছিলাম স্কুলে। ক্লাস সেভেনে পড়ে এখন। প্রাইভেট টিউটরও আমি জুটিয়ে দিয়েছিলাম। বেশ চটপটে স্মার্ট মেয়ে। দেখলে মনেই হবে না সুবোধের মেয়ে। সেই মেয়েটা, স্যার, কাল সন্ধ্যায় একটা অ্যাকসিডেনটে—

চা হাতে ঘরে ঢুকছিল সুচরিতা। আজ বিশেষ দিন, তাই হয়তো নবীনের জন্যও চা। 'অ্যাকসিডেনট' শব্দটা শুনে থমকে দাঁড়াল সুচরিতা। আর সুচরিতাকে দেখে অথবা চায়ের কাপ হাতে সুচরিতাকে দেখে অ্যাকসিডেনটের মতো একটা মারাত্মক শব্দযুক্ত বাক্যও সম্পূর্ণ না করে নবীন থেমে গেল।

অ্যাকসিডেনট শব্দটাই দমকলের ঘণ্টার মতো বা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অন্তত প্রতীপের কাছে। তার বুকের ভিতর সহসা ঢাক বেজে ওঠে। সে কাঁতর হয়ে পড়ে।

—আ, তুমি থামলে কেন নবীন, বলো। কেমন করে হল, কেমন আছে সুবোধের মেয়ে? জোর তাড়া দেয় প্রতীপ।

সুচরিতা শুধু সুগৃহিণী নয়, সুন্দরীও। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। সাধারণ বাঙালি মেয়েদের চেয়ে সে কিছুটা লম্বা—পাঁচফুট পাঁচ। সামান্য মোটা কিন্তু লম্বা বলেই তা কারো-কারো চোখে আরও মানানসই। দীর্ঘ ভ্রূপল্লবের ছায়ায় স্নিগ্ধ সজল চোখ। একটু হয়তো বা শীতল। প্রসাধনের বাহুল্য নেই, কিন্তু

সুচরিতা জানে কখন কেমন সাজ মানায় তাকে। তার ভঙ্গিতে কোথাও উপেক্ষা নেই, আবার কাউকে যেন খুব কাছেও টানে না।

সুচরিতা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল টেবিলে। শাড়ির আঁচল গুটিয়ে প্রতীপের পাশে নবীনের মুখোমুখি সোফায় বসল। মেয়ে বিস্তি ফড়িঙের মতো লাফাতে-লাফাতে তাদের পাশ দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেল। অন্য দিনের মতো আজ কেউ দরজা থেকে রাস্তা পর্যন্ত বিস্তির যাওয়া লক্ষ করার জন্য উঠল না।

প্রতীপের তাড়াতেও নবীন মুখ খুলল না। সে ভাবছিল সুচরিতার সামনে মুখ খোলা ঠিক হবে কিনা। সুচরিতা যে তাকে খুব পছন্দ করে না—এ কথা নবীনও জানে। ছটফট না করে ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখা করলেই ভালো হত, ভাবল সে।

ধৈর্য হারানোর পক্ষে সময়টা যথেষ্ট বেশি। ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ ভেঙে পড়ে, উত্তেজিত প্রতীপ ধমক দিয়ে ওঠে: মজা পেয়েছ না! সকালবেলা আমার টেনশান বাড়াতে এসেছ? 'অ্যাকসিডেনট'! ব্যস, তারপর মৌনী হলেন উনি। বলি, সব কথা খুলে বলবে তো!

আজকাল এরকমই হচ্ছে। একেবারেই চাপ সহ্য করতে পারে না প্রতীপ। কেমন ভয়-ভয় করে সামান্য কিছুতেও। টেনশান হলেই মাথার ভেতর গুম-গুম আওয়াজ শুরু হয়, ফুসফুসে যেন হাওয়া ঢোকে না। কাল যেমন বাজারে হয়েছিল।

কাল বাজারে ভালো চিংড়ি দেখে দর জানতে চেয়েছিল প্রতীপ।

—দু শ টাকা।

—একটু কম হয় না? দেড়শ টাকা হলে দাও চার-পাঁচটা।

ওই চার-পাঁচটা চিংড়ির ওজন অন্তত ছ-সাত শ গ্রাম। কম না। টাকার হিসেব করছিল প্রতীপ।

—এ জিনিস নেবার লোক আলাদা, সবার জন্য নয়। লোকটা বলেছিল। এরকম উত্তর তো কেউ আশা করে না। লোকটা প্রতীপকে একেবারেই চেনে না—তাও হয়তো নয়। এটা বড়ো বাজার। তবু মাসে দু-এক বার তো আসা হয়। নামডাকওয়ালা লোক নয় প্রতীপ, কিন্তু একেবারে যদু-মধুও তো নয়। সে ভালো চাকরি করে, পোশাক-আশাক ভালো, ভালো বাসায় থাকে। তবে? গায়ে লাগবারই কথা।

কয়েক বছর আগে এমন হলে হাতাহাতি হয়ে যেত। ছুটির দিনের বাজার। প্রচুর লোকজন। কথাটা আরও লোকের কানে পৌছোয়। হল্লা শুরু হয়, তর্ক, খিস্তি। হাতাহাতি হয় আর কী! প্রতীপ ভিড়ের ফাঁক গলে ফুড়ুত। চিংড়ি কেনা হয় নি। যদি মারামারি লাগে—এই ভয়েই প্রতীপের কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। মারামারি লাগলে তোমার কী? প্রতীপ মনকে শান্ত করার চেষ্টা করেছে এই প্রশ্ন তুলে। তবু মন শান্ত হয় নি সহজে। মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অশান্তি আর অস্বস্তিতে কাল পুরো বেলা কেটেছে। আবার আজ!

'অ্যাকসিডেনট' শব্দটা শুনে সুচরিতাও থমকে দাঁড়িয়েছিল মুহূর্তের জন্য। ঘটনার বিবরণ জানার ইচ্ছে তারও। তা বলে প্রতীপ যে ভঙ্গিতে তার উত্তেজনা প্রকাশ করল তা সুচরিতার একেবারেই পছন্দ হল না। সে তাকাল প্রতীপের দিকে। দৃষ্টিতে তার আপত্তি লেখা।

—বলছি স্যার। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে নবীন শুরু করল। বাড়িতে এসেছেই যখন কথাটা না বলে তো ফেরা যায় না।

—মেয়েটা কাল সন্ধ্যাবেলা প্রাইভেটে পড়ে বাড়ি ফিরছিল। লোডশেডিং ছিল। একটা স্কুটার পেছন থেকে ধাক্কা মেরে চলে যায়। ছোটো মেয়ে, ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশে নর্দমার ওপর। স্কুটারওয়ালা দিব্যি কেটে যায়। ভয়ে-শকে জ্ঞান হারিয়ে মেয়েটা কতক্ষণ ওভাবে পড়েছিল কে জানে। পড়বি পড় আমার নজরেই। না হলে কী হত একবার ভাবুন, স্যার। আমি দেখলাম নানা জায়গায় কেটে-ফেটে গেছে। হাতে চোট, পায়ে চোট, পিঠে চোট। তো, আমি তাকে তুলে তদ্দণ্ডে দিয়ে এলাম কাছের নার্সিং হোমটায়। বনফুল। কাল রাতটা কেটেছে ভয়ে আর দুশ্চিন্তায়। সুবোধটা এমন অমানুষ, তার মধ্যেই কোত্থেকে ভিডিওতে একটা সিনেমা দেখে এল। নাকি টিকিট কাটা ছিল। বুঝুন। কী বলবেন?

প্রতীপ বলল, ও কথা থাক, মেয়েটা এখন কেমন আছে বলো।

—এখন ও ভালো আছে, মনে তো হচ্ছে বিপদ কেটেছে। তবে বাহাত্তর ঘণ্টা তো দেখা দরকার। ডাক্তারবাবুরাও তাই বলছেন। তা ছাড়া কী সব টেস্ট, এক্সরে ইত্যাদিও নাকি জরুরি। প্রচুর টাকা লাগবে। সুবোধকে বললাম, যা—টাকা জোটা। সে বলল, টাকা আমি কোথায় পাব? নার্সিংহোমে দিলে কেন?

প্রতীপ আর সুচরিতা টানটান হয়ে শুনছিল এতক্ষণ। প্রতীপ সুবোধের মেয়েকে চেনে। আগে মাঝে-মাঝে বাবার পিছু-পিছু লাজুক পায়ে মেয়েটা আসত তার কাছে। মাঝে অনেকদিন আসে নি। নামটা মনে পড়ে না, মুখটা মনে পড়ে আবছা।

সুচরিতা সুবোধ বা তার মেয়ে কাউকেই চেনে না। অ্যাকসিডেনটের খবর শুনলেই তো মন খারাপ হয়। এ তো উল বুনতে-বুনতে টিভির খবর শোনা নয়, এ হল তাজা খবর, এক শহরের আর-এক বাসিন্দার খবর। তবে এখনও ভালো আছে মানে বিপদ কেটেছে—এমন সরল সিদ্ধান্তে পৌছোতে সুচরিতার অসুবিধে হয় না।

নবীন বলল, বুঝুন স্যার—আমি কী ফ্যাসাদে পড়েছি। সুবোধ টাকা জোটানোর তো কোনো চেষ্টাই করলে না, উলটে আজ সকাল থেকে আমার ঘাড়ে লাফাচ্ছে। সে বলছে, মেয়েকে আমার হাসপাতালে নিয়ে চলো।

সুচরিতা বলল, সুবোধ তো ঠিকই বলেছে, নবীন। সে গরিব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাবে? হাসপাতালে গেলে বিনে পয়সায় চিকিৎসাটা তো হয়।

—হয় না। হাসপাতালে তো আমাকে প্রায়ই যেতে হয়। আমি জানি। নিদারুণ অবস্থা দিদিমণি, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। এক্স-রে মেশিন আছে—চলে না, খারাপ। রক্ত নেই। ওষুধ আনতে হয় বাইরে থেকে কিনে। ডাক্তারবাবুরাও নার্সিং হোম নয়তো চেম্বারে বসে থাকেন। তাঁদের কাজ করারও ইচ্ছে নেই, ক্ষমতাও নেই। ওয়ার্ডে-ওয়ার্ডে দেখতে পাবেন কুকুর, জুয়োর আড্ডা আর খুচরো নেতা। চিকিৎসা হয় না। কপালজোরে যদি বাঁচে তাও খুঁতো হয়ে ফেরে। আমি জেনেশুনে সুবোধের মেয়েকে ওখানে নিয়ে যেতে পারি, বলুন?

প্রতীপ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না-না, নবীন, তুমি ঠিকই করেছ।

নবীন এই প্রথম হাসল। সেই মোহন হাসি। বলল, জানি তো স্যার, আপনি এ কথাই বলবেন। আপনারা গুণী বিচক্ষণ মানুষ, আপনারা বুঝবেন ঠিক। আর সেজন্য সবার আগে আপনাদের কাছেই আসা। আপনি স্যার একটু সুবোধকে বুঝিয়ে বলবেন, ওর মেয়ের ভালোর জন্যই তো, নইলে আমার কী স্বার্থ—

—বটেই তো। আচ্ছা পাঠিয়ো সুবোধকে, আমি বুঝিয়ে দেব।

—আর-একটা কথা, স্যার। নার্সিং হোমের খাঁই তো আপনি জানেন। এক্স-রে-টেক্সরে নানা ফ্যাচাং বাকি। সব আটকে আছে টাকার অভাবে। শ পাঁচেক অলরেডি গলে গেছে, আরও শ পাঁচেক এখুনি চাই। নেহাত আমি আছি তাই বেশি চাপ দিতে পারছে না। তবে টাকা না পেলে আর এগোবেও না হয়তো। সব আটকে আছে টাকার অভাবে। সব আটকে…

সব আটকে আছে টাকার অভাবে—কথাকটা হাতুড়ির মতো নিয়মিত ঘা বসাতে থাকে প্রতীপের

মনে। মন খারাপ হয়ে যায় তার। টাকার অভাবে কেন চিকিৎসা থেমে থাকবে? প্রতীপ তাকায় সুচরিতার দিকে।

সব আটকে আছে টাকার অভাবে—কথাটা বার-বার শুনে সুচরিতা বিরক্ত হয়। ধার চাইলে না বলাটা অনেক সহজ। এ তো ধার নয়, সাহায্য। চ্যারিটি। ঘ্যানঘ্যান করা ভিখিরির মতো। দু-চার-দশ নয় পাঁচশ টাকা! হাসপাতালে অব্যবস্থা তো কি মানুষ যাচ্ছে না? সব গরিব মানুষ নার্সিং হোমে ঢুকে পড়বে আর তাদের সাহায্য করতে হবে? —না। তাকেও সংসার চালাতে হয় যথেষ্ট হিসেব করে সাধ্যের সীমা মেনে। আরও একটা সীমানা আছে—ভব্যতার। মুখখানা যথাসাধ্য করুণ করে সুচরিতা তাকায় নবীনের দিকে।

—মাসের শেষ যে নবীন, হাতে কিছু নেই।

নবীন সরখেলের মুখটা ফের কালো হয়ে যায়। তবে কিনা সে হল কাজের লোক, অভিজ্ঞতাও প্রচুর। সুচরিতার সোজা-সাপ কথা বোঝার অসুবিধে কী। তবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে শেষবারের মতো একটা চিল ছোঁড়ে শূন্যে।

—মেয়েটার কপালটাই বোধহয় মন্দ, স্যার। যার বাপেরই কোনো বোধ নেই, তার ভালো করব আমি, তেমন ক্ষমতা কি আর ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন। তবে সবাই যদি অল্প-অল্প করেও—। যাক।

নবীনকে এভাবে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেওয়াটা পছন্দ হয় না প্রতীপের। কাছেই পার্সটা ছিল। কাল বাজার করার পরও বরাদ্দ টাকার কিছু রয়ে গেছে হাতে। কিছু তার হাতখরচের টাকা। চটপট যা ছিল সব বার করে সে নবীনকে দিয়ে দিল। নব্বই টাকা। মুখে বলল, হাল ছেড়ো না নবীন, চেষ্টা করো। তোমার তো চেনাজানা অনেক। এত লোকের এত উপকার করেছ, তোমাকে কি মানুষ ফেরাতে পারে?

২

ব্যাঙ্কে কাজের চাপে ভুলে ছিল বেশ। সন্ধ্যায় ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে ডোর-বেলে হাত রাখতে গিয়ে মনে পড়ল সব।

কাল রাতে সুচরিতা আর প্রতীপ চুক্তি করেছিল—বিবাহবার্ষিকীতে কোনো তর্ক নয়, বিবাদ নয়, মন খারাপ নয়, মেজাজ খারাপ নয়। প্রতিটি বিশেষ দিনের জন্য এরকম বিশেষ চুক্তি হয়। সুচরিতা যতই সুচারুভাবে সংসার চালাক না কেন, আর প্রতীপ যতই না কেন নিজেকে সংসারের নিত্য-দিনের খুঁটিনাটি থেকে দূরে রাখুক, মাঝে-মাঝে ঠোকাঠুকি লাগে।

—বউকে অপদস্থ করে নিজের ইমেজ বানাতে লজ্জা করে না তোমার? নবীন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সাথে-সাথেই রাগে ফেটে পড়ে সুচরিতা। চুক্তি ভেঙে খানখান।

প্রশ্ন শুনেই প্রতীপ বুঝে যায় জল কোন্‌দিকে গড়াচ্ছে। যা সে করেছে তা দুঃসাহসিক। ভয় বা অজ্ঞানতার বশে লোকে যেমন দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলে। পরিণাম ভাবলে করতে পারত না। আক্রান্ত প্রতীপ হেসে হালকা কথায় পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করে।

—ইমেজ বানাব, ওই ভবঘুরে নবীন সরখেলের কাছে! তাও আবার তোমাকে অপদস্থ করে! কী যে বল। বরং আজ যে তুমি অসময়ে নিজের হাতে ওর জন্য চা বানিয়ে আনলে এতেই তোমার—

—থাক। থামিয়ে দিল সুচরিতা। —আমি যে বললাম হাত খালি, মাসের শেষ, তারপরও তুমি তাকে টাকা দিলে। কেন? আমার হাতে কি টাকা ছিল না? নাকি আমি এমনই অমানুষ যে খবরটা শুনে আমার মন খারাপ হয় নি? যা টাকা ছিল সবটাই তো ধরে দিতে পারতাম। আজ একটা বিশেষ দিন বলেই না। তোমাদের মুখ চেয়ে—কী

ভাবল···

কান্নায় ভেঙে পড়ে সুচরিতা। প্রতীপ বোঝানোর চেষ্টা করে। —শোনো, তোমার হাতে যে কিছু টাকা আমাদের জন্য আছে সে তো আমি জানি। সে টাকা তো দিতে বলি নি। হাতে সামান্য যা ছিল দিয়েছি। ধরো, যদি কাল চিংড়ি আনতাম তবে তো কিছু হাতে থাকত না। দিতামও না।

—ওই টাকাটাও আমার টাকা। আমার জমানো টাকা। আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম। নবীনকে দেবার হলে আমিই দিতাম। একবার যাচাই করেও দেখলে না। একটা ঠগ জোচ্চোর—

প্রতীপ আর কী বলে। টাকা রোজগার করে সে। মাইনের টাকা বউয়ের হাতে তুলে দেবার পর টাকা হয়ে যায় বউয়ের। এই কথাটা শুনে-শুনে তারও এমনই একটা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। নিজের কোনো নৈমিত্তিক প্রয়োজনে দশটা টাকা মাইনে থেকে সরিয়ে নিলেও নিজেকে কেমন চোর-চোর মনে হয়।

প্রতীপ মাথা ঠাণ্ডা রেখে আর একবার বোঝানোর চেষ্টা করে। —লোকটা তো নিজের প্রয়োজনে টাকা চাইতে আসে নি। এরকম ঘটনা তোমার চোখের সামনে ঘটলে তুমিও তাই করতে যা নবীন করেছে। নবীন গরিব মানুষ, সুবোধও গরিব মানুষ। আমরা সাহায্য না করলে নার্সিং হোমের খরচ তারা মেটাবে কী করে?

—আমি হলে, বললাম তো নবীনকে, মেয়েটাকে নার্সিং হোমে না দিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতাম।

—তাতেও খরচ হত। তা ছাড়া, আজ যদি তোমার মেয়ের এরকম কিছু হত, দিতে পারতে এখানকার হাসপাতালে? ক্লাস সেভেনে পড়লে কী হয়, আমি তো জানি, সুবোধের মেয়েটা একেবারে বিস্তর বয়সী। বিন্তিও সন্ধেবেলা যায় ট্যুশনি পড়তে। যদি—

—তুমি থামবে! সুচরিতা গর্জে ওঠে। —কেবল অকথা-কুকথা। টাকা দেওয়াটা যদি উচিত মনে করলে ব্যাঙ্কে গিয়েও দিতে পারতে। আমি যখন বলেছি হাত খালি, সে মুহূর্তেই টাকাটা না দিলে চলছিল না?

—শোনো, এটাকে প্রেসটিজ ইস্যু কোরো না। টাকা তুমি দিলে না আমি দিলাম, বাড়িতে দিলাম না ব্যাঙ্কে বসে দিলাম—কী আসে যায় তাতে?

—আসে যায়, আর সেটাই তুমি বোঝ না।

বোঝার কোনো রকম চেষ্টা না করে প্রতীপ রণে ভঙ্গ দেয়।

দরজা খুলে দিল বিন্তি।

—মা কোথায়?

—ভেতরের ঘরে। এসে থেকে দেখছি শুয়ে আছে। কত ডাকলাম, উঠল না।

প্রতীপ ভেতরে-ভেতরে গুটিয়ে যায়। শুয়ে আছে মানে সুচরিতার রাগ পড়ে নি এখনও। লক্ষণ সুবিধের নয়। কেনাকাটা বাকি, রাতের খাওয়া বাইরে, এখন তো রাত নটা বাজার আগেই দোকানপাট বন্ধ হয়ে যায়।

—কিছু বলে নি তোকে?

—কী স্বপ্ন দেখেছে নাকি দুপুরে। আগডুম-বাগডুম। আমি কতদিন মাকে বলেছি যে দুপুরে ঘুমোলে এরকম হয়।

এই খবরটা পেয়ে একটু স্বস্তি পায় প্রতীপ। স্বপ্ন দেখার রোগ আছে বটে সুচরিতার। বিষয়বস্তুর বিষয় তাহলে আছে হয়তো। পারিস্থিতি সামাল দেওয়ার রাস্তা পাওয়া যেতে পারে। সোফায় গা এলিয়ে বসল প্রতীপ। দুদণ্ড বিশ্রাম। ব্যাঙ্ক থেকে ফিরে চোখ বুজে এই দণ্ডদুই বিশ্রামে হারিয়ে-যাওয়া শক্তির কিছুটা যেন ফেরত পাওয়া যায়।

—বাবা, চা।

চায়ের টানে চোখ মেলল প্রতীপ। সকালেও ঠিক এই চেয়ারটাতেই বসেছিল প্রতীপ। সামনে

ছিল একটা বিবর্ণ ওয়াল-হ্যাঙ্গিং। সেটা নেই। তার বদলে অন্য একটা। বাঁদিকের দেওয়ালের ছবিখানাও বদলে গেছে। ঘরের কোনায় টাটকা ফুল। আলমারির বইপত্র গোছানো। কোথাও ধুলো নেই, ঝুল নেই। ঘরে ফ্রেশনারের হালকা মিষ্টি গন্ধ।

—বেশ লাগছে, না রে।

—যাক, তোমার চোখে পড়েছে তাহলে। এ ঘর আজ আমি নিজে সাজিয়েছি। একা।

—তাই নাকি। বাঃ। তুই তো বড়ো হয়ে গেলি রে।

চা শেষ করে শূন্য কাপ প্রতীপ তুলে দেয় মেয়ের হাতে, গাল টিপে আদর করে।

—বাবা, আমরা বেরোব কখন? আরো দেরি করলে অসুবিধে হবে, দেখো।

—তাই তো। দেখি।

প্রতীপ উঠল। শোওয়ার ঘরে গেল।

শোওয়ার ঘরের আলো নেভানো ছিল। চিত হয়ে শুয়ে ছিল সুচরিতা চোখে হাত রেখে। প্রতীপ আলো জ্বালাতে পাশ ফিরল। ধরা গলায় বলল, আঃ আলো জ্বালালে কেন?

—সে কী কথা, সন্ধেবেলা আলো জ্বালাব না? শুয়ে আছ যে, কী হয়েছে, শরীর খারাপ নাকি?

কোনো জবাব পেল না। পাশে গিয়ে বসল প্রতীপ। চুলে বিলি কাটাতে-কাটাতে বলল, এখনও রাগ পড়ে নি বুঝি। বেশ বাবা, ক্ষমা চাইছি। আজ আর রাগ করে শুয়ে থেকো না। এবার এমন সুড়সুড়ি দেব না।

—রাগ করে শুয়ে নেই।

—তা হলে? ঘর গোছাও নি নিজের হাতে, চুল বাঁধ নি, সাজগোজ কর নি।

উঠে বসল সুচরিতা। চোখ মুখ ফোলা-ফোলা। থমথমে। হাঁটুতে থুতনি রেখে বলল, আমার মন ভালো নেই।

—কেন? দুপুরে স্বপ্ন দেখে নিশ্চয়ই। তা কী এমন দেখলে স্বপ্নে, যে মন খারাপ?

সুচরিতা বলল, শুনে হাসবে না তো?

হাসি তো পাচ্ছেই। তবে সে হাসি কৌতুকের নয়, সে হাসি সন্তোষের। সকালের তর্ক-ঝগড়া যে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে নেই, আর তা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় তৃপ্ত প্রতীপের ঠোঁটে হাসির রেখা।

—বলো। কথা দিলাম. হাসব না।

স্বপ্নের বিবরণ দিল সুচরিতা। আজ সকালে যে দুর্ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে গেছে নবীন অনেকটা সেরকম। তফাত এই যে, মেয়েটা সুবোধের নয়, মেয়েটা তাদের বিন্তি।

হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তবু হাসতে পারে না প্রতীপ। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলে নয়, আপন সন্তানের বিষয়ে শঙ্কা অমূলক হলেও যেন খোঁচা দিয়ে যায়। প্রতীপ মৃদুস্বরে বলল, ও তো স্বপ্ন। শোনাল অনেকটা প্রবোধবাক্যের মতো।

—সত্যিও হতে পারে।

প্রতীপ মুখে বলল, না হতে পারে না। তার মন বলল, হতেও পারে। তারপর সে মাথা ঝাঁকাল। যত্তোসব। অমঙ্গলচিন্তায় মেজাজ নষ্ট করার কোনো মানেই হয় না।

সুচরিতা প্রতীপকে বলতে পেরেই যেন মুক্ত। যেন তার বুকের ওপর থেকে পাথর সরে গেল। হেসে বলল, তোমার জন্যই তো এমন একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলাম।

—বাঃ, তুমি স্বপ্ন দেখলে আর দোষ হল আমার!

—তুমি তখন বললে কেন—যদি তোমার মেয়ের এরকম কিছু হত—

—বেশ, দোষ সবই আমার। এখন ওঠো, তৈরি হও। বেরোব।

সুচরিতা উঠল। ওয়াড্রোব খুলে জামাকাপড় বার করতে-করতে বলল, নবীন আর আসে নি ব্যাঙ্কে?

—না বোধ হয়, আমার কাছে তো আসে নি। প্রতীপের মনে পড়ল, আজ সারাদিন সুবোধকেও চোখে পড়ে নি।

—তুমি গেছিলে নার্সিং হোমে?

—না তো। আমি সেখানে গিয়ে কী করব?

সুচরিতা ঘুরে দাঁড়াল। তার পোশাক এখন অতি সাধারণ, শরীরে অলঙ্কার নেই, নেই কোনো প্রসাধনও।

—তুমি কী গো, মেয়েটার খোঁজ নিলে না? একবার গেলেও তো পারতে। অথচ সকালে কষ্টে একেবারে ভেঙে পড়ছিলে।

পোশাক পালটাতে-পালটাতে প্রতীপের মনে হল, মেয়েটার খবর নেওয়া উচিত ছিল। সকালে ভালো ছিল তো কী, খারাপ হতে কতক্ষণ। উদ্যোগ নিলে অফিসেও তো কিছু টাকা তোলা যেত। তা সকালে সুচরিতার যা মেজাজ সে দেখে গেছে! এখন সুচরিতার কথা শুনে প্রতীপ বুঝল, বড়ো ভুল হয়ে গেছে।

—এখনও যাওয়া যায়। নার্সিং হোম ঘুরেই না হয় বাজার যাব। বেশি দূর তো নয় বনফুল।

সুচরিতা বলল, সেই ভালো।

প্রস্তাব শুনে বিন্তির মেজাজ গরম। —এসব খুচরো কাজ আগে সেরে রাখতে পার না। কত দেরি হয়ে যাবে। তখন রেস্তোরাঁ খোলা পাবে হয়তো, বাজার খোলা পাবে না, দেখো। কিছু কেনা হবে না।

প্রতীপ বলল, হবে রে বাবা, সব হবে। ব্যস্ত হোস না।

—না হয় কাল যেয়ো নার্সিং হোম?

—না না, আজই যাব, সুচরিতা বলল। —নাই বা হল গিফ্‌ট্ কেনা। এবার ওসব বাদ থাক। নবীন বা সুবোধ যদি চায় টাকাটা ওদের দিয়ে দেব।

বিন্তি জানে এ বাড়িতে মায়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আজ তারও কিছু কেনার ইচ্ছে, তাও হবে না। বাড়াবাড়ি নয়তো কী। বিন্তি বিড়বিড় করে—বড়ো অদ্ভুত তোমরা। কার না কার মেয়ে অসুস্থ, তার জন্য একেবারে হঠাৎ সব বরবাদ। সিলি!

প্রতীপ আর সুচরিতার বুকের ভিতর তখন এক ভীষণ তাড়া, অন্যরকম। তারা দুজনে দ্রুত হাতে বাড়ির জানালা-দরজা বন্ধ করছে তুমুল শব্দ তুলে। মেয়ের কথা তাদের কানেই ঢুকল না।

এপ্রিল ১৯৯২ সংখ্যায় "সমাজতন্ত্রের সংকট" বিষয়ে অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।

ব্রাত্য, মন্ত্রবর্জিত লালন ফকির

[ষষ্ঠ কিস্তি]

সুধীর চক্রবর্তী

১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসকের দপ্তরে লালনভক্তদের মুখপাত্র হয়ে ফকির মন্টু শাহ কুষ্টিয়ার একজন মুসলমান অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন : 'আমরা বাউল। আমাদের ধর্ম আলাদা। আমরা না মুসলমান না হিন্দু। আমাদের নবী সাঁইজী লালন শাহ। তাঁর গান আমাদের ধর্মীয় শ্লোক। সাঁইজীর মাযার আমাদের তীর্থভূমি। আমরা যারা তাঁর ভক্ত, আমরা সকলেই এক বিশেষ নিয়মে ভেক গ্রহণ করি। আমাদের সৃষ্টি নেই, মানে বিবাহ নেই—সন্তানজন্ম নেই। আমাদের গুরুই রসুল।

যেহি তো মুরশিদ সেহি তো রসুল
এ দুইয়ে নেই কোন ভুল
মুরশিদ খোদা ভাবলে জুদা
তুই পড়বি প্যাঁচে।

স্যার···ডক্টর সাহেব [অর্থাৎ উক্ত মুসলমান অধ্যাপক] ···আমাদের এই তীর্থভূমিতে ঢুকে আমাদের ধর্মের কাজে বাধা দেন। কোরআন তেলওয়াত করেন, ইসলামের কথা বলেন, মিলাদ মাহফিল করে থাকেন, এ সবই আমাদের তীর্থভূমিতে আপত্তিকর। আমরা আলাদা একটা জাতি, আমাদের কলেমাও আলাদা —লাইলাহা ইল্লাল্লাহ লালন রসুলুল্লাহ।'[১]

ফকির মন্টু শাহ-র বক্তব্য যদি সাম্প্রতিক লালন-পন্থীদের বক্তব্য বলে মনে করি, তবে বুঝতে হবে ১৮৯০ সালে প্রয়াত লালন ফকিরের প্রয়াণের শতবর্ষের মধ্যে তাঁকে ছেঁউড়িয়ার ভক্তমণ্ডলী রসুল [অর্থাৎ আল্লার প্রেরিত পুরুষ, ধর্মবিধির প্রবর্তক, রসুলই নবী] পদে উন্নীত করেছেন। লালনের জীবদ্দশায় এমন দাবি ওঠে নি এবং তিনি নিজেও এমন সম্ভ্রান্ত পদের দাবিদার ছিলেন না। তিনি বরং বলেছিলেন যিনি আল্লা তিনিই রসুল, তিনিই নবী। সেই কথা ইসলামি "আকিদা" বা বিশ্বাসে ঘোরতরভাবে আপত্তিকর।

তাঁদের বিশ্বাস আল্লা এক ও লা-শরিক। যাঁরা আল্লাকে স্বীকার করেন আবার সঙ্গে-সঙ্গে আল্লার গুণে অন্যকে শরিক বা অংশী মনে করেন তাঁদের বলে "শিরক্"। এঁরাই বহুত্ববাদী বা মুশরিক। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে লালন একজন মুশরিক। বিরোধিতার একটা মূল সূত্র এখানে। বাকিটা লালনপন্থীদের আচরণ নিয়ে। ইসলামি বিধিশাস্ত্রে বিশ্বাসকে বলে "আকিদা"। কোন্ কাজ ফরজ (বৈধ), কোন্ কাজ হারাম (অবৈধ), কোন্‌টি পাক (পবিত্র), কোন্‌টি না-পাক (অপবিত্র)—ইসলামি বিধিশাস্ত্রে তা নির্দেশিত আছে স্পষ্টভাবে। ফকিররা সজ্ঞানে এবং সচেতনভাবে, ইসলামি মতে যা হারাম ও না-পাক, তার ব্যবহার করেন বলে বিরোধিতার আরেকটা সূত্র জাগে। মূলত এই দুই বিরোধিতার সূত্র থেকে বাউল ফকির বা নাড়াদের এককালে দমন ও পীড়ন করা হয়েছে। যেমন জানা যাচ্ছে :

> এ দেশের কতিপয় মহাপ্রাণ ইসলামের খাদেম এই বাউলদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। আলমডাঙ্গার ফরিদপুরের তৎকালীন সাতশো ফকীরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন মীরপুর উপজেলার সীমান্ত গ্রাম শ্রীরামপুরের তৎকালীন সংস্কারক মুন্সী মেজাজ আলী। আর একজন বাউল-বিরোধী নেতা ছিলেন কুষ্টিয়ার এককালীন খ্যাতিমান মন্ত্রী শামছুর রহমানের বড়োভাই মওলানা আফছারউদ্দীন। ইনি সরাসরি ছেউড়িয়ার লালন আখড়ায় ঘোড়া চালিয়ে বাউলদেরকে বিতাড়িত করেন। মুন্সী মেজাজ আলী ছিলেন মাজু গ্রামের মহান সংস্কারক আলেম মওলানা নেছারউদ্দীনের যোগ্য শিষ্য। মুন্সী সাহেবের একটি দল সব সময়ের জন্য কাঁচি রাখত। যেখানেই বাউল নাড়াদের সঙ্গে দেখা হত অমনি বাবরী চুল কেটে দিত। গানের বাদ্য-যন্ত্র খোল করতাল কেড়ে নিত। এমনিভাবে বাউলদমনদল ব্রিটিশ আমলে ছিল অনেক। যার ফাল তারা সমাজে অত্যন্ত হীন ও অপাংক্তেয় হয়ে বসবাস করত।···এরা যে সত্যিকারের ইসলামের শত্রু আলেমগণের আন্দোলনে তা প্রকাশ পেয়েছিল।[২]

ব্রিটিশ আমলে এই বাউলদমনদল গঠন এবং পীড়নের ঘটনা অনেক ঘটেছিল, যার বিস্তারিত প্রতিবেদন আজ পাওয়া কঠিন। তবে কেন যে এই বাউলদমন তার কারণ বোঝা যায় এই মন্তব্যে যে, তারা,

> মুসলিম নামের অন্তরালে হিন্দুদের অংশিবাদ, জন্মান্তরবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অহংবাদ ইত্যাদি মতবাদ ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে ইসলামের মূল-নীতিতে ফাটল ধরাতে স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সমাজের লোকদের কাছে সাধু আচরণ দেখিয়ে গান-গীতির অন্তরালে ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে।···কেবল ঐ গানের মাধ্যমে এদের মতবাদ প্রচার হতে থাকে।[৩]

একটি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের বিরুদ্ধে কেবল গানের শব্দ ব্যবহার, বাউলের নিঃসঙ্গ একতারা যেন একটা রুদ্ধ সঙ্গীতের প্রতীক ও প্রতিবাদ। সন্দেহ নেই গানে-গানে গাঁথা এসব প্রতিবাদ লালনের রচনা প্রধানত, অথবা তাঁর শিষ্য দুদ্দুর। কট্টর ইসলামে বিশ্বাসী অনেকে আবার সংগীতবিরোধী। বিশ শতকের গোড়ায় একদল আলেম মুসলমানদের পক্ষে গীতিচর্চা না-জায়েজ ঘোষণা করেছিলেন। তখন লালনশিষ্য দুদ্দুর শাহ লেখেন :

গান করিলে যদি অপরাধ হয়
কোরাণ মজিদ কেন ভিন্ন এলহানে গায়॥
আরবী পারসী সকল ভাষায়
গজল মরাসিয়া সিদ্ধ হয়
নবীজী যখন মদিনায় যায়
'দফ' বাজায়ে মদিনায় নেয়॥

এসব যুক্তিতে ধর্মধ্বজীদের মনোভাব পালটায় নি। তাই আসাদুল্লা নামে একদল নীতিবাগীশ গানকে হারাম এবং বেদায়াত ঘোষণা করে ব্যঙ্গচ্ছলে

লেখেন :

কোন কোন পীর লোক বাজনা বাজায়
সুর দিয়া গান করে হাততালি দেয় ॥

এ মন্তব্যের জবাবে আবদুর রসিদ চিস্তি লেখেন :

যে গানের সাহায্যে আল্লাহ্ ও রসুলের প্রতি আসক্তি জন্মে, তাহাকে ধর্মসঙ্গীত বলে। কিন্তু মৌলবী সাহেবদিগের ফতাওয়া অনুসারে যদি তাহাও বেদায়াৎ হয়, তবে মৌলবী সাহেবেরা ওয়াজের মজলিসে মওলানা রুমের মসনবী, দেওয়ান হাফেজ, দেওয়ান শামন তবরেজ, দেওয়ান লোৎক, দেওয়ান মইনুদ্দিন চিস্তি, দেওয়ান জামী প্রমুখ সিদ্ধ পুরুষদিগের দেওয়ান ও মসনবীর বয়াত গাহিয়া ওয়াজ করেন কেন? যত দোষ কি কেবল বাঙ্গলা গানের বেলায়?[৪]

আসলে গান একটা উপলক্ষমাত্র, আলেমদের শঙ্কা ছিল সার্বিক। লালনোত্তর দেশকালে ফকিরিতন্ত্রে এত বেশিসংখ্যক লৌকিক স্তরের মুসলমান দীক্ষিত হতে আরম্ভ করে যে একটা "গেল গেল" রব ওঠে। ছোটো-ছোটো পুস্তিকা বেরোতে থাকে গ্রামেগঞ্জে। প্রচারধর্মী, সংস্কারমুখী সে সব পুস্তিকা গ্রামেগঞ্জে সাধারণ মুসলমানদের কাছে শরীয়তবাদীরা প্রচার করতে থাকেন। মহম্মদ আলীর "মিথ্যা পীর", ফজলে রহিমের "পীরমুরিদ", মহম্মদ সৈয়দের "মারফতনামা" বইগুলিতে নানা বক্র মনোভাব ধরা পড়েছে। একটি কেতাবে বলা হয়েছে বুঝিবা ইসলামের শেষ অবস্থা আসন্ন। কেননা কিয়ামতের তিনটি লক্ষণ সমাজে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। যেহেতু—

ইমাম গজ্জালি লিখেন কিতাবে।
কিয়ামতের তিন নিশান জানিবে ॥
বেশরা দরবেশ হবে যেইকালে।
কিয়ামত হবে জেনো সেইকালে ॥
দলিল মতে আলেম নাহি চলিবে।
কোরান ও হাদীশ কেবল পড়িবে ॥
আমীর ও সর্দার যত দুনিয়ার।
জাহেল হইবে তারা একেবার ॥
এই তিন গোরো যবে হইবে।
মুসলমানী আর নাহি রহিবে ॥
সেই অক্ত এবে বুঝি আসিল।
বেশরা ফকির বহুত হইল ॥
জাহেল সর্দার যত আছিল।
বেশরার কাছে মুরিদ হইল ॥
বেদাতী আলেম যত দুনিয়ার।
ঝুটা দরবেশের তারা হয় ইয়ার ॥
মুসলমানী এবে গেল হায় হায়।
কিয়ামত আসিল এবে বোঝা যায় ॥

এখানে কেয়ামতের তিন নিশান বলতে বোঝানো হয়েছে (১) বেশরা (শরিয়ত-বিরোধী) ফকির-দরবেশদের প্রাদুর্ভাব হবে যখন, (২) আলেমরা যখন ইসলামি শাস্ত্রমতে চলবেন না এবং (৩) আমীর ও সর্দার পংক্তির মান্যতাযুক্ত ব্যক্তিরা যখন বেশরা দরবেশদের শিষ্যত্ব নেবেন। এই তিন লক্ষণ প্রকট হয়েছিল বলে বই-পুস্তক লিখে সংস্কারকরা সুপথে ফেরাতে চেয়েছিলেন পথভ্রষ্ট মুসলমানদের।

"বাউল ধ্বংস ফৎওয়া" বইতে এ ধরনের প্রলুব্ধকারী বাউল ও নাড়ার ফকিরদের (যাঁদের কণ্ঠধার্য ছিল লালনের নানা "বিচার" গান) "মোরতেদ" বলা হয়েছে। মোরতেদদের সম্পর্কে শরীয়তি দণ্ডবিধানের নির্দেশনামায় বলা হয়েছে :

কোন মোছলমান যদি মোরতেদ হয় তবে পুরুষ হইলে তাহাকে তিনদিন পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিয়া পুনরায় মোছলমান করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও যদি সে এছলাম গ্রহণ না করে তাহা হইলে অনতিবিলম্বে শরীয়তি তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।...আর যদি স্ত্রীলোক হয়, এছলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত তাহাকে কারাবদ্ধ রাখিতে শরিয়তি আদেশ করিতেছে।

হজরত আবু হানিফ (রঃ) বলিয়াছেন, এছলাম ত্যাগি স্ত্রীলোককে প্রত্যেক দিন মারিতে হইবে। কেহ-কেহ দৈনিক তিন কোড়া মারিতে বলিয়াছেন। আর হজরত হাছান (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যহ ৩৯ কোড়া এছলাম গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত মারিতে হইবে।[৫]

এই পর্যন্ত নির্দেশদানের পরে ফতোয়াতে বলা হয়েছে এমন দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা শরিয়তমতে কেবল বাদশাহ বা কাজির এক্তিয়ারে পড়ে। 'অমোছলমান রাজ্যে পবিত্র শরীয়তের এই বিধানগুলি কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব।' অতএব বাউলদমনের দলগঠন এবং ফকিরদের উপর অত্যাচার। ফকিরদের বা পীরদের আকর্ষণে পর্দানসীনা মুসলমান অনেক নারী যে শুদ্ধান্তঃপুর ত্যাগ করে বেশরা ধর্মে শামিল হয়েছিলেন তার বর্ণনা পাই আরেক পুঁথিতে। সেখানে খেদের সঙ্গে অসহায়ভাবে লেখক বলেছেন :

যুবতী আওরত যত
ফকির হইল কত
স্বামী ছাড়ি পীরের সঙ্গে যায় ॥

এই-সমস্ত স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে নির্দেশ ছিল :

বেনামাজি আওরত যদি কাহার ঘরে হয়।
তালাক দেয়া মস্তাহাব কেতাবেতে কয় ॥
তালাক দিয়া করিবে দূর সেই দুরাচার।
ঝাড়ু মারিবেক তার শিরের উপর ॥

আলেম মুসলমান সমাজ মুসলমান অন্তঃপুরে আরও নানা রীতিকৃত্যে হিন্দুসংস্কৃতির চিহ্ন দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মুন্সী সমীরউদ্দিন দেশের মুসলমান সমাজে নানা দুরাচারের উল্লেখ করেছেন :

দেশের বেদাত থোড়া হৈল ফের মনে।
তাহার বয়ান কহি শুন সর্বজনে ॥
ছলি দেওলি আর জিতিয়া দুতিয়া।
বাউনি সাঁকরাত করে এছলাম হইয়া ॥
ভাইফোঁটা গরু পরব করে মোছলমানে।
লক্ষ্মীবারে কর্জ্জ দিবা লিবাতে বারণ।
দেশের বেদাত এইছা কি কহিব কায় ॥

এখানে বেদাত (মূল কথা বিদা আত) কথাটার মানে বোঝা দরকার। বেদাত বলতে বোঝায়—সুন্নাতে যার কোনো ভিত্তি নেই, দীনের ক্ষেত্রে যা অভিনব তাই বিদাত। সুন্নাত মানে পন্থা বা পথ। আল্লার নির্দেশ আর রসুলের বাণী ও কাজ অনুযায়ী মুসলমানদের পালনীয় জীবনাদর্শ বা পথই সুন্নাত। দীন মানে ধর্ম। সত্যিই আল্লার নির্দেশ বা রসুলের বাণী ও কর্মকাণ্ডে এবং সার্বিক ইসলাম ধর্মে হোলি, দেওয়ালি, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, পৌষসংক্রান্তিতে খড়ের বাউনিবাঁধা, গরু-পরব বিশেষত বৃহস্পতিবারে ধার না-দেয়া বা না-নেওয়ার বিধান নেই। কিন্তু এগুলি প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক দেশাচার। হিন্দুধর্মচিহ্নিত ঠিক বলা যাবে না এসব কৃত্যকে, বরং বাঙালি লোকজ সংস্কৃতির চিহ্ন বা বহুকাল ধরে বহতা লোকজীবনের স্মৃতি ও বিশ্বাস এসব আচরণে ধরা আছে। পীরবাদ এই বহমান লোকজীবনের বিশ্বাসে আঘাত না করে কৌশলে নিজের আসন পেতেছিল গ্রাম্য মানুষের অন্তরে। উপাস্য আল্লা এবং উপাসক ভক্তের মাঝখানে পীর বা মুরশিদ নিজেকে স্থাপন করেছিলেন সাধারণ সরল পল্লীমানসের বিশ্বাস উৎপাদন করে। তাঁরা বোঝাতেন, হাকিমের কাছে নিজের মামলা বোঝাতে যেমন উকিল লাগে, হক হাকিম আল্লার কাছে তেমনই যেতে হবে মুরশিদ ধরে। এর পরের স্তরে মুরশিদ আর মাধ্যমমাত্র না থেকে হয়ে ওঠেন খোদ আল্লা। লালন বলে দেন: "যেহি মুরশিদ সেহি খোদা"। এই পীর বা মুরশিদের বিরুদ্ধে তকবিয়াতুল-উল-ঈমানে বলা হয়েছে :[৬]

কেউ পীর পয়গম্বরকে ডাকে আর মনে করে যে পীর বা পয়গম্বর তাকে আল্লার সমীপে নিয়ে যাবে; সে এটা ভাবে না যে পীর আর পয়গম্বর তার থেকে দূরে আর আল্লা নেহাৎই কাছের মানুষ। এটা এরকমই যে একজন প্রজা নিজের বাদশার কাছে একলা বসে আছে আর ঐ বাদশাহ তার আর্জি শোনার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু সেই রায়ত যদি কোন উজিরকে দূর থেকে

ডেকে বলে যে আমার তরফে এই কথাটা হুজুরের সামনে পেশ করবেন সে হয় অন্ধ নয় পাগল।

কিন্তু সাধারণ বর্গের মানুষকে এসব বোঝানো কঠিন। "Keep the known one before you to learn the unknown"—তত্ত্ব অনুযায়ী অজানা আল্লার চেয়ে জানাচেনা মুরশিদ অনেক নির্ভরযোগ্য।

লালন নিজে এবং ফকিরিতন্ত্র সাধারণভাবে খোদা আর মুরশিদকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন বলে শরিয়তবাদীরা তাঁকে "মোয়াত্তেদ" ও "কাফের" আখ্যা দিয়েছেন। ফৎওয়ায় স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে : 'খোদার শরীক করিও না। শেরেক্ [অংশীবাদী] সর্ব্বপ্রধান গোনাহ [পাপ]। কোন পয়গম্বর, অলি [আল্লার সাধক], দরবেশ, ফেরেশ্‌তা খোদা হইতে পারে না।' স্বভাবতই লালনকে মুশরেক [বহুত্ববাদী] বলা হয়েছে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে। অথচ আশ্চর্য যে, লালনের শিষ্য দুদ্দু উল্‌টে মৌলবাদীদের কাফের বলেছেন। তাঁর বাণী :

নবী ছেড়ে খোদাকে চায়
মোয়াহেদ কাফের তারে কয়।
দুদ্দু কয় নবী দয়াময়
যে কদমে খোদার কদম পায়॥

কদম মানে পা, অর্থাৎ আল্লার চরণাশ্রয় পেতে নবীর চরণ ভরসা। লালন তো একধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'আপনি খোদা আপনি নবী', আবার যে মুরশিদ সে-ই খোদা, আদমের মধ্যেও খোদা বিরাজিত। এসব উচ্চারণ ঘোরতররকম অনৈস্লামিক। লালনের আরও কিছু দীপ্র সাহসী ঘোষণা মনে আসে প্রসঙ্গক্রমে। যেমন :

মুরশিদকে মানিলে খোদার মান্য হয়।

লালনের চিন্তাসূত্র অনুসরণ করলে বোঝা যায়—রূপকে ধরে তিনি অরূপকে বুঝতে চান। তাই সিনা ও সফিনা অর্থাৎ হৃদয় ও গ্রন্থের মধ্যে হৃদয়গত উপলব্ধি তাঁর কাছে মহত্তর এবং গ্রহণীয়। নবুওত (অবতার) আর বিলায়ত (পীর) এই দুয়ের মধ্যে তাঁর টান বিলায়তের দিকে। কারণ নবুওতে আছে "অদেখা ধেয়ান" আর বিলায়তে আছে "রূপের নিশান"। অদেখার উপাসনা অযৌক্তিক, কেননা "অদেখারে দেখে কেমনে চিনি"? এইবারে তাঁর কথা হল নবুওত আর বিলায়তের পার্থক্য বুঝতে হয় মুরশিদকে ধরে। কাজেই মুরশিদ সবচেয়ে গুরুবস্তু।

মুরশিদের কাছেই লালন বুঝেছেন যে আহাদ (আল্লা) ও আহমদ (হজরত মহম্মদ) আসলে একই স্বরূপ। আহমদ শব্দগঠনে চারটি হরফ লাগে, যথা—আলেফ-হে-মীম-দাল। এর থেকে মীম অক্ষর বাদ দিলে আহাদকে পাওয়া যায়। অর্থাৎ আহম্মদের মধ্যেই রয়েছেন আহাদ। মীমে অক্ষরের পর্দা সরালেই তাঁকে পাওয়া যাবে। লালনের মূল গান এখানে দেখা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে—

আলেফ হে আর সিম দালেতে
আহম্মদ নাম লেখা যায়।
ও সে সিম হরফ তার নফি করে
দেখনা খোদা কারে কয়॥
আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজলিরে অদেখার প্রায়।
আহাদে আহম্মদ হল
করলি নে তার পরিচয়॥

গানের শেষ কালে লালন বলেছেন 'কাঠমোল্লা যে ভেদ না বুঝে গোল বাধায়'।[৭] শেষ ব্যঙ্গোক্তি থেকে বোঝা যায় লালন বলতে চাইছেন, প্রকৃতপক্ষে আহাদ ও আহম্মদে ভেদ আছে অথচ নেই—কাঠমোল্লারা একথা বোঝে না। এখানে লালনের যুক্তিসূত্র দারুণ মেধায় শানিত। মূলতত্ত্ব দুভাবে দেখতে হবে। প্রথমত, আহাদ ও আহমদ আসলে এক, মাঝখানে কেবল সিমের ব্যবধান। দ্বিতীয়ত, সিমের সম্মোহন রেখে সৃষ্টিকর্তা আহাদ ও আহম্মদকে জুড়ে দিয়েছেন। একেই বলে অরূপের রূপায়ণ। এই রূপায়ণের আবশ্যিকতা কী? তাঁর মতে :

শুনতে নাই আন্দাজী কথা
বর্তমানে জানো হেথা।

একই যুক্তির ক্রমে লালন আরেক গানে বলেছেন :

গুরু ছেড়ে গৌর ভজে
তাতে নরকে মজে।

আন্দাজী পথ ছেড়ে বর্তমানকে ধরা, অরূপকে ধরতে রূপাশ্রয়, আল্লাকে জানতে নবীকে জানা, গৌরভজনার আগে গুরুভজনা, আত্মজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞান লাভের জন্য মুরশিদের বাক্য অনুধাবন—লালন পর পর যুক্তির নিশ্ছিদ্র পথ কাটেন। এর পরে তাঁর প্রশ্ন : "বস্তু চিনে নামে পেট কি ভরে"? অর্থাৎ বস্তুজ্ঞান হলে নামের কোন মাহাত্ম্য বা প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ক্রমে প্রমাণ হয় বাক্য ও কথার নিষ্ফলতা—তখন প্রশ্ন ওঠে :

না জেনে করণ কারণ কথায় কি হবে?
কথায় যদি ফলে কৃষি বীজ কেন রোপে?

নাম বা শব্দও নিষ্ফল বা অর্থহীন, কেননা :

গুড় বললে কি মুখ মিঠা হয়?
দিন না জানলে আঁধার কি যায়?
তেমনি জেনো হরি বলায়
হরি কি পাবে?

নাম-শব্দ-অনুমান-আন্দাজ সবই ত্যাগ করে খোদ্‌কে চেনা দরকার। সেই খোদ্‌কে জানার প্রথম কাজ হল আত্মতত্ত্ব বা নিজেকে জানা। সে কাজ কঠিন, কারণ,

আমি কি তাই জানলে
সাধন সিদ্ধি হয়।
আমি শব্দের অর্থ ভারি
আমি সে তো আমি নয়॥

ভালো করে লালনগীতি পড়লে বোঝা যায়, তাঁর গানের মূল ভিত্তি আত্মতত্ত্ব। পরের ধাপগুলি তারই প্রসারণ। সেই বিস্তারে আসে পরতত্ত্ব, মুরশিদ তত্ত্ব; সবশেষে বোঝা যায় বস্তুতত্ত্ব। বস্তু অর্থে বেশির ভাগ গানে ত্যোতনা রয়েছে বীর্যের যা পিতৃবস্তু অর্থাৎ সংরক্ষণীয়। যার অযথা ব্যবহার ও ক্ষয়ে আত্মস্থতা কমে গিয়ে শরিক (অর্থাৎ পুত্রকন্যা) জন্মায়। সেই দিক থেকে তাঁর সাধনাও লা-শরিক। পিতৃবস্তুর অন্যায় ব্যয় রোধ করবার পথ দুটি। এক, শ্বাস বা দমের প্রক্রিয়ায় শুক্রপতনের শরীরী নিয়ন্ত্রণ; দুই, নারীর জননাঙ্গকে মাতৃযোনিরূপে জেনে নিয়ন্ত্রণ। ফকিরিতন্ত্রে শব্দ নিয়ে খেলা আর রূপকের ছায়াবাজি থাকে চমকপ্রদ। যেমন আদম শব্দকে ভেঙে তাঁরা বলেন আ-দম, অর্থাৎ যে দমের নিয়ন্ত্রণ জানে। তেমনই নারীর জননাঙ্গের রূপক হল বাবার পুকুর। এবারে শোনা যাক দুটি লালনগীতি :

১. কেন ঝাঁপ দিলিরে মন
বাবার পুকুরে—
কামে চিত্ত পাগলপ্রায় তোর এ।
কেন রে মন এমন হলি
যাতে জন্ম তাইতে মলি?

সিরাজ শা দরবেশে কয়
শক্তিরূপে ত্রিজগৎময়
কেন লালন ঘোরে বৃথাই
আত্মতত্ত্ব না সেরে॥

নারীর মধ্যে শক্তিরূপার উপলব্ধি খুব একটা নতুন কথা নয়, অন্তত এই তন্ত্রের দেশে। তবে লালন-পন্থার ঝোঁক রয়ে গেছে আত্মতত্ত্বের দিকে। শব্দের খেলায় সন্তানজন্মহীনতাকে তাঁরা বলেন লা-শরিকের সাধনা। শব্দের খেলাতেই তাঁরা বলেন বিসমিল্লা মানে বিচমিল্লা। বিচ মানে বিছন বা বীজ, জন্মবীজ—বীর্য। অর্থাৎ বীর্যই আল্লা বা বীর্যই আল্লা। তাতেই জন্ম এবং তার অপব্যবহারে মৃত্যু, তার নিয়ন্ত্রণেই উত্তরণ—কাম থেকে প্রেমে। এবারে দ্বিতীয় গান :

যেখানে সাইর বারামখানা
শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে
দেখে যেন ভুজঙ্গনা।

যা ছুঁইলে প্রাণে মরি
এ জগতে তাইতে তরি।

আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সে হয়েছে

যে ধনের উৎপত্তি প্রাণধন
সে ধনের হল না যতন।

এবারে বোধহয় লালনের তত্ত্ব অনেকটা স্বচ্ছ হল। আত্মতত্ত্ব মানে বস্তুবোধ, তার সুমিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। কামে বশীভূত হয়ে, দীপের আলোয় মুগ্ধ পতঙ্গের মতো, ঝাঁপ দেওয়া নয়, বরং কঠোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণ লালনের অভিপ্রেত। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ কেবল দৈহিক কসরত নয়, তার পিছনে আছে সংবেদ।

লালন তাঁর গানগুলি হয়তো আত্ম-আস্বাদনের জন্য লিখেছিলেন কিংবা শিষ্যদের বোঝাতে। তবে তিনি নিম্নবর্গের জন্য গান লিখলেও তাঁর গানে উচ্চ ভাবধারার সূক্ষ্ম ছাপ পাওয়া যায়। সম্ভবত মানুষটি ছিলেন উচ্চবর্ণজাত। 'ইতোরপনা'-কে তিনি বরাবর ধিক্কার দিয়েছেন। কেউ-কেউ লালনের তত্ত্বচিন্তায় একটি মৌল ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রীয় ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। অথচ আশ্চর্য যে, লালনের মৃত্যুর পরে নানা পুস্তিকায় লালনপন্থীদের কদাচার ও বীভৎস রুচি সম্পর্কে মন্তব্য ও ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। তবে কি তাঁর অনুগামীরা ভ্রষ্ট হয়েছিলেন, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার অতিরেকে? নাকি লালনপন্থা সম্পর্কেই প্রতিবাদ ছিল শুদ্ধতাবাদীদের? এ প্রশ্নের মীমাংসার আগে বিরুদ্ধপক্ষীয়দের বক্তব্য শোনা যেতে পারে। বলা হয়েছে :

১. তাহারা হায়েজ নেফাজের রক্ত [রক্ত : স্রাব] বীর্য, মল, মূত্র, গর্ভজাত শিশুর মাংস, গাঁজা, ভাঙ, মদ ইত্যাদি নাপাক [অপবিত্র] জিনিস ভক্ষণে রিপুদমন করে।
২. স্ত্রী-যোনী ও অগ্নিকে ছেজদা [প্রণাম] করে।
৩. দলে-দলে স্ত্রীপুরুষ একত্র উলঙ্গ হইয়া নাচিয়া গাহিয়া কাম-রিপু দমন হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা করে।
৪. তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্ত্রীকে ব্যবহার করিয়া হিংসা রিপু দমন করে এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিত হইয়া খমক খঞ্জরী জুড়ি বাজাইয়া দেহ-তত্ত্ব ফকীরি গান করতঃ ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।
৫. তাহারা বলে জবেহ করিয়া মাংস খাওয়া ও মাছ মাংস খাওয়া, ঈদে কোরবানী করা, পাঁচওয়াক্ত নামাজ পড়া, শরীয়তের আলেমগণের কথা শুনা, শরীয়তের মতে চলা, ত্রিশপারা কোরআনকে মানা, মোছলমানের কোরআনে নাই।
৬. তাহারা বলে 'যত কাল্লাহ তত আল্লাহ্' অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের ভিতর আল্লা আছে সুতরাং প্রত্যেক মানুষই আল্লাহ্। অতএব তাহারা একে অপরকে ছেজদা [প্রণাম] করিয়া থাকে।
৭. ফকিরগণ বলিয়া থাকে যে নেশা (শরাব, মদ, গাঁজা, ভাঙ ইত্যাদি) সেবন না করিলে মন ঠিক থাকে না। মন ঠিক না হইলে জেকের বন্দেগী ও ভজন সাধনে কোন ফল হয় না। নেশা খাইলে মন নির্মল (সাদা) হয়, কোনো প্রকার চিন্তা থাকে না।
৮. হজ্জ মানুষের ভিতরে রহিয়াছে। মক্কায় হজ্জ করিবার আবশ্যক নাই। মজ্জাগুহ মানুষেই (এব্রাহিম পয়গম্বর দঃ) গড়িয়াছে। খোদার নির্মিত ঘর মানব-দেহ। তাই মানুষকে ছাড়িয়া কাবা গৃহের জেয়ারত (সম্মান) পরিবার প্রয়োজন নাই।
৯. তাহারা বলে; গাছ রোপণ করিয়া ফল খাইতে হয়—অর্থে কন্যা, ভাতিজী, নাতিনী ইত্যাদিকে নিজ স্ত্রীর মত ব্যবহার করিতে দোষ নাই।
১০. এক কুঁড়ার জল সকলেই পান করিতে পারে। এইরূপ একজন স্ত্রীকে সকলেই ব্যবহার করিতে পারে। তাহাতে কোন দোষ নাই। কারণ স্ত্রীজাতি গঙ্গাস্বরূপা।
১১. গর্ভ-পতিত শিশুর মাংস ভক্ষণ অতীব পবিত্র। নিষ্পাপীর কচি মাংস ভক্ষণ করিলে নিষ্পাপ গর্ভ গোঁসাই (?) হয়।[৮]

মনোযোগ দিয়ে অভিযোগগুলি পড়লে বোঝা যায় এর অনেকগুলি অবাস্তব ও স্ববিরোধী, এমনকী অতিকল্পনার ফসল। যাঁরা নিরামিশাষী তাঁরা কি করে গর্ভপাতের শিশুর মাংস ভক্ষণ করতে পারেন? বন্ধনহীন প্রণয় মানেই কি ব্যভিচার? মাদকাসক্তি ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ে বহুলভাবে দীর্ঘদিন প্রচারিত। বিশেষভাবে বাউল ফকিররাই বোধ হয় এ ব্যাপারে অপরাধী নয়। দেহ-তত্ত্বের গান গেয়ে ভিক্ষা করাও কি খুব বড়ো অপরাধ?

প্রকৃতপক্ষে লালন তাঁর গানে শরিয়ত এবং পাঁচটি কৃত্য (কলমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত), সম্পর্কে এমন সমালোচনা করেছেন এবং বিরুদ্ধযুক্তি হাজির করেছেন যে সেকালের কাঠমোল্লাদের সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়ীদের বিরোধিতা অবশ্যম্ভাবী ছিল। ভজন-সাধন সম্পর্কে লালনের মতামত ছিল সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁর প্রথম প্রশ্ন :

ভজে পাই কি পেয়ে ভজি
কি ভজনে সে হয় রাজি?

এখানে অদৃশ্য উপাস্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ পেয়েছে। কারণ তিনি মারফতি পন্থায় বিশ্বাসী। সেই বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে লালনের জিজ্ঞাস্য :

পাঁচরোক্ত নামাজ পড়ে
শরা ধরে কে পায় তারে?

এরপরের উচ্চারণ :

মারফতের পথিক যারা
শরার কেতাব নেয় না তারা।

শরা মানে শরিয়ত, যা কেতাব- ও আচরণ-সর্বস্ব। মারফতি সাধনা অনুভবের। শরা হল means, কিন্তু মারফত end। লোকজ যুক্তিতে শরিয়ত হল সিঁড়ি, মারফত হল ঘর। মারফতে অবলম্বন করতে হয় দেহকে, সেইজন্য দেহধারী মানুষ তাঁদের উপাস্য। তাই বলা হয়েছে, "খদ আর খোদা উভয়ে একজন / খদকে ধরে কর ভজন"। তীর্থব্রত উপবাস মারফতি মতবাদে উপহাস্য। যেমন বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জঙ্গলে যাওয়া। লালন ব্যঙ্গ করে বলছেন :

তীর্থে যাবি সেথানে কি পাপী নাই রে?
ও কেউ নারী ছেড়ে জঙ্গলেতে যায়
স্বপ্নদোষ কি হয় না সেথায়?
আপন মনের-বাঘ যারে খায়
কে ঠেকায় রে॥

তীর্থ প্রসঙ্গে কাশী ও মক্কার কথা এসে পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান দুই শাস্ত্রবদ্ধ ধর্মের লক্ষ্য এই দুই পবিত্র তীর্থে। কিন্তু ওই দুই জায়গার ঐশী তাৎপর্য লোক-ধর্মে বিশেষ মূল্য পায় না বরং তাঁদের মনে হয় :

কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন
ধ্যানহ্যারণা ভজনপুজন মানুষ সর্ব ঠাঁই॥

মানুষের উপস্থিতির মহিমাতেই যে তীর্থস্থানের গৌরব এমন কথা বেশ নতুন। লালন অবশ্য তাঁর মারফতি অবস্থান থেকে আরেক ধাপ এগিয়ে বলেছেন :

১. পড়গে নামাজ জেনে শুনে।
নিয়াত বাঁধগে মানুষ-মক্কা পানে॥
মানুষে মনস্কামনা সিদ্ধি কর
বর্তমানে—
খেলছে খেলা বিনোদ কালা
এই মানুষের তন-ভুবনে॥
২. আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে—

বানিয়েছে সাঁই উর্ধ্ব শহর
এই মানুষ-মক্কা এ
কত লাখ লাখ হাজী করেছে রে হজ
সেই জায়গায় বসিয়ে॥

রহস্য-উদ্বেল মারফতি মানসের কল্পজগতে তন-ভুবনে (দেহের জগতে) মক্কার অস্তিত্ব। সেখানে বিনোদ কালার রঙ্গভূমি এমত কল্পনা এক চমকপ্রদ সমন্বয়-ভাবনার সৌন্দর্যে রূপময়। এই মানবদেহধারী লক্ষ লক্ষ জীব তার নিত্য সাধনার অঙ্গীকারে মানবদেহেই মক্কা সৃজন করে তুলছে। তারাই হাজী প্রকৃত অর্থে এবং সেই হজের জন্য গতিময় ভ্রমণের প্রয়োজন নেই। এক জায়গায় বসে আত্মস্থ হয়ে সেই হজব্রত পালনের শুদ্ধি। ভাবনার অন্য স্তরে মনে হয়েছে মুরশিদের চরণই আসল মক্কা।

হজের পিঠোপিঠি ওঠে নামাজের কথা। খাঁটি নিষ্ঠাবান মুসলমান দিনেরাতে পাঁচবার নামাজ পড়েন। 'নামাজ পড়া বলিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহাতে রুকু, ছেজদা, কওমা, জল্‌ছা, উঠা, বসা ইত্যাদি নামাজের নিয়ম বা ক্রিয়া আছে। সেসব নিয়ম শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা সম্পূর্ণ করতঃ নামাজ পড়িতে হয়। নামাজ পড়া শারীরিক কছরৎ ব্যতীত হইতে পারে না।' মারফতিরা এসব কেতাবি নির্দেশে শামিল হতে চান না, কারণ "পশ্চিমদিকে খাড়া হয়ে শরা ধরেকে পায় তারে?" সংশয় এখানেই। তা ছাড়া প্রশ্ন হল—

নামাজ পড় যত মোমিন মুসলমানে—
আল্লাজি সদর হন না দিদার দেন না
সেজদা কর কার সামনে?
হয় আপনি আল্লা আপন মনে॥

যে-আল্লা সামনে আসেন না, দর্শন দেন না তাঁকে প্রণতি জানাই কী করে? তাঁকে মনে-মনেই জানা সঠিক জানা। ফকিরদের এই মতের সঙ্গে লালন আরেকটি কথা যোগ করে বলেছেন :

পড়গে নামাজ ভেদ বুঝে সুঝে—
বরজখ নিরিখ না হলে ঠিক
নামাজ আরো মিছে।

বরজখ বলতে এখানে বোঝাচ্ছে উপাস্য আর উপাসকের মধ্যস্থতা করেন যিনি অর্থাৎ মুরশিদ। লালনের বক্তব্য মুরশিদের সহায়তা ছাড়া নামাজ মিছে, কেননা তিনিই প্রকৃত নামাজ ও ব্যর্থ নামাজের ভেদ বুঝিয়ে দেন। লালনের মতে প্রকৃত নামাজ হল দায়েমি নামাজ, যা সদাসর্বদা চলে। বিশেষভাবে মসজিদ বা কোনো স্থানে জায়নামাজ পেতে এই নামাজ করতে হয় না। দায়েমি নামাজ আসলে শ্বাসের নিয়ন্ত্রণ। শ্বাসপ্রশ্বাসই তো সর্বক্ষণের মানবসঙ্গী। লালন বলছেন :

১. পড় রে দায়েমি নামাজ এ দিন হল আখেরি।
মাশুক রূপ হৃদয়ে রেখে
দেখ আশাক বাতি জ্বেলে
কিবা সকাল কিবা বিকাল
দায়েমির নাই অবধারি॥

২. না পড়িলে দায়েমি নামাজ সে কি রাজি হয়
কোথায় খোদা কোথায় সেজদা করি সদায়।
প্রিয়তমের রূপ হৃদয়ে রেখে প্রেমের বাতি জ্বালিয়ে সকাল-সন্ধ্যা সদাসর্বদা দায়েমি নামাজ পড়াই সঠিক কাজ। দায়েমি নামাজ পড়লে বোঝা যায় খোদা আছেন দেহ-মসজিদে, সেখানেই হতে হয় প্রণত। আনুষ্ঠানিক নামাজে একজায়গায় থাকেন খোদা, প্রণাম পড়ে আরেক ঠাঁই—লালনের গানে এই বিচার।

বিচারে আরও পরিস্ফুট হয়, লালনের সঙ্গে ইসলামি ধর্মাদর্শের আর ধর্মকৃত্যের নানা বিষয়ে বিরোধ ছিল। সে বিরোধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে নয়, কারণ লালন মারফতিপন্থার সামগ্রিক অনুগামী। তিনি যেন তাত্ত্বিক নেতার মতো মারফতিদের মতবাদকে নিষ্কাশিত করে তাঁর অসামান্য প্রকাশভঙ্গি ও যুক্তিপরম্পরায় উপস্থাপিত করেছেন গানে গেঁথে। শরিয়তবাদীদের সঙ্গে লালনের বিরোধ তত্ত্ব এবং বিশ্বাসের। যেহেতু তিনি মুসলমান হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেন নি, রেখেছেন একটা সচেতন আড়াল, তাই তাঁর তত্ত্বকে ইসলামবিরোধী বলা ঠিক হবে না।

তাঁর কোনো-কোনো গানে হিন্দুধর্মশাস্ত্র আর হিন্দু আচরণবাদেরও প্রতিবাদ দেখা যায়। তবু কেন বিশেষভাবে মৌলবী ও মৌলানারা লালনপন্থার নিন্দা করেছেন এবং তাঁকে মোরতেদ বলেছেন? তার কারণ, সম্ভবত, লালনপন্থার বহু ফকির অজ্ঞ মুর্খ গ্রামবাসী মুসলমানদের নিজেদের মারফতি মতে নিয়ে আসছিলেন, যা মুসলমান আলেম সমাজের পক্ষে অস্বস্তিকর হয়ে উঠছিল। এ ছাড়া গ্রাম্য ফকিরদের ছিল ব্যাধি আরোগ্য করার বিশেষ জাদুশক্তি। আজ পর্যন্ত বাঙলার লোকজ ধর্মকেন্দ্রগুলিতে অলৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের নানা কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। মন্ত্রপুত তেল, বিশেষ থানের মাটি, সিদ্ধগুরুর দেওয়া কবচ-তাবিজ, জলপড়া, হত্যে দেওয়া জাতীয় কুসংস্কার এবং অন্ধবিশ্বাস পল্লীসমাজে আর অশিক্ষিত নিম্নবর্গে খুব জনপ্রিয়। লালন নিজে এ-জাতীয় কাজের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর শিষ্য দুদ্দু গানের মধ্যে খেদ প্রকাশ করেছেন এই ভাষায়,

মলি কেন দরগাতলায়
হত্যে দিয়ে মন—
সকল দরগার গোড়া
চিন্‌লিনে সেই মানুষ রতন।

অন্য এক গানে তাঁর খেদ,

তাবিজ বেচে খায় সবাই কোন্ আইনে?
দীনের রসুল ভুখা থেকে
কর্ম করে খায় আপনে।
সাতদিন থেকে অনাহারে
দীনের নবী কর্ম করে
সে নবীর উম্মত হয়ে
তাবিজ বেচো জেনেশুনে?
অকর্মা অলস যারা
তাবিজ বেচে খায় তারা
যেমন ধারা ব্রাহ্মণেরা
মিথ্যা কর্ম করে পয়সা গুণে॥

যে কোনো মিথ্যা ও চাতুর্য, অলৌকিকতা ও ভণ্ডামিকে লালন ঘৃণা করতেন তা বোঝা যায় তাঁর লেখা গান মন দিয়ে পড়লে। তাঁর সাধনা ছিল বর্তমানের, তা অনুমানবিরোধী। উচ্চবর্গের ধর্মাচরণকে তিনি বলেছেন "আন্দাজী পথ"। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল :

অদৃশ্য ভজনা করা
অন্ধকারে সর্প ধরা।

প্রত্যক্ষভাবে প্রার্থিতকে জানা চেনা, তাঁকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি, এই ছিল লালনের সাধনীয়। অপ্রত্যক্ষ, অগোচর, কাল্পনিক দেবতা কি অবতারে তাঁর আস্থা ছিল না। প্রত্যক্ষ এবং অতিচেনা মুরশিদ ধরে সাধনা ছিল তাঁর অভিপ্রেত। তাই একটা গানে বলেছেন :

মুরশিদ ভজনা বিনে ও জীবের উপায় নাই।
রোজা নামাজ হজ্ব, জাকাত মানা কিছু নাই—
মুরশিদ ভজনা বিনে জীবের আর গতিক নাই॥

দেখা যাচ্ছে রোজা নামাজ ইত্যাদি বাহ্য আচারকে তিনি একেবারে বর্জন করতে বলেন নি, কিন্তু মুরশিদ ভজনা চাই-ই চাই। এতে কৌশলে আরেকটা ইঙ্গিত গাঁথা আছে। মুরশিদের সঙ্গ করলে বাহ্য আচারের নিষ্ফলতা বোঝা যাবে ক্রমে-ক্রমে। ধর্মের আচরণে অজ্ঞান-তিমিরান্ধকে মুরশিদ জ্ঞানাঞ্জন পরাবেন, কারণ 'মুরশিদ জ্ঞানের দাতা / জ্ঞান ছাড়া ভজন বৃথা'। এই জ্ঞান আত্মজ্ঞান, শব্দান্তরে দেহের জ্ঞান বা বস্তুজ্ঞান। বর্তমানে তা প্রাপণীয়, অনুমানে নয়। সেইজন্যই লালন বলেন,

এই নয়নে তারে না দেখিলে
মুখের কথায় পরান জুড়ায় না।
শুনে কথা সবাই বলে
ও গোর দেখেছি কেউ বলে না॥

এই পর্যন্ত বলে লালন প্রশ্ন তুলেছেন,

যে দেখেছে বর্তমানে
অনুমান সে মানবে কেনে ?

একই প্রশ্ন তুলেছিলেন আলেপ নামে একজন গীতিকার। তাঁর বক্তব্য ছিল :

না দেখে রূপ মহম্মদার কি করে ভজি ?
কেবল শুনি কর্ণেতে দেখিনিকো চোখেতে।

চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করতে চান লালন তার মারফতি পন্থায়। সেই পন্থায় যেমন আনুষ্ঠানিক ধর্মাচার এবং প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর তিনি বিরোধী, তেমনই তাঁর লড়াই ছিল বুজরুকি ও অলৌকিকতার বিরুদ্ধেও। বৈরাগ্যব্রতীদের সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গমুখর লেখনী শোনবার মতো। বলছেন :

আজগৈবি বৈরাগি-লীলা দেখতে পাই—
হাত বানানো চুলদাড়ি সব —
বাসায় গেলে কিছুই নাই।
যাত্রার দলেতে দেখি—
জট বানাইয়া সাজে যোগী
এ বা কেমন জাতবৈরাগি
কোন্ ভাবের ভাবুক রে ভাই ॥

কিন্তু লালনের ব্যঙ্গ এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর পরে ফকিরিতন্ত্রে বুজরুকি ও অলৌকিকতার চর্চা কমে নি। রোগ নিরাময়ের অছিলায় এদেশে এক-শ্রেণীর বাউল-ফকির-দরবেশ নানারকম ঔষধ-তাবিজ-কবচের ব্যাবসা করে চলেছেন। অবশ্য নানা ভেষজ ও কন্দের নিগূঢ় গুণাগুণ তাঁরা পরম্পরায় জেনেছেন এবং পল্লীঅঞ্চলে এঁদের সমাদর ও জনপ্রিয়তা আজও চলমান। এই দ্রব্যগুণের ব্যবহার জানেন বলে একদল দুর্বলচিত্ত অসহায় ব্যাধিপীড়িত মানুষ ফকিরদের সমর্থক ও অনুগামী। আলেমদের নিষেধ ও ধর্মীয় অনুশাসন উপেক্ষা করে উনিশ-বিশ শতকের সন্ধিকালে বহু মুসলমান ফকিরি-মতে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ফকিররা নানা কৌশলে ব্যাধি বিতাড়নের ক্রিয়াকলাপের ফাঁদে তাঁদের মারফতি মতে টেনে নিয়েছেন। সাধারণ মুসলিম লোকমানসে ফকিরদের প্রতি আস্থা এবং তাঁদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ পাওয়া যায় ১৮৯৮ সালে লেখা আবদুল ওয়ালির নিবন্ধ থেকে। তিনি লিখেছেন :

> I had in my employ a servant aged apparently 22, who had been suffering form *intestine cholic*, which had reduced him to a mere skeleton. He tried several medicine while in my employ, and after he had left it, with no effect. Those who are acquainted with the disease, can testify that it is hard to cure, and baffles the skill of physicians. For a time I did not see the young man. Inquiry revealed that a Faqir—commonly called Nārā'r Faqir —had cured him of the malady. When I next saw him, I found him a new man—hale, hearty and robust. I tried my best to have at alk with the Faqir, and to procure from all other sources information regarding the mode of the treatment, and the medicines used. But beyond the fact that they can cure all diseases that flesh is heir to, I could gather no useful information.[৯]

বসিরহাটের কাজি মৌলবী কেরামত উল্লা ও গোলাম কিবরিয়া ছাহেবান প্রণীত "মনোরঞ্জন উচিত কথা" (১৮৮৯) বইতে লেখা আছে :

> ফকীরগণ রোগীর রোগ আরামকরণের জন্য তিনটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহার নাম যোগধরা গরম চন্দ্র ও লাল চতুর্মুখ বটিকা। যে কোন প্রকার রোগ হউক না কেন একটি গরম চন্দ্র বা লাল চতুর্মুখ ও যোগধরা বটিকা জলের সহিত মর্দন করিয়া খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রোগীর রোগ আরাম হইবেক।

মারফতি ফকিরদের এই হেকমতি বিশ শতকের গোড়ায় মোল্লা-মৌলবীদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে-

ছিল। ফকিররা যে ভাবেই হোক, বেশ কিছু মানুষকে বোঝাতে পেরেছিলেন তাঁদের কাছে সঞ্জীবনী আছে, আছে অমরতার সিদ্ধি। দমের কাজ (শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ) সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে জরা-মৃত্যুকে জয় করা যায়। এঁরাই নানা উপলক্ষে লালনের গান গাইতেন, যাতে একটা অপ্রকাশ্য অলীক কুহকের জগৎ সকলের সামনে শরীরী হয়ে উঠত। এখানে উল্লেখ্য যে লালনের যে বিশ্বাসের জগৎ তাতে প্রকাশ্য ও গোপ্য দুটি পন্থাই স্বীকৃত। ভারতের সকল দেহাত্মবাদী সাধনাতেই মিষ্টিক বাতাবরণ আছে। লালনের মতো সাধক "সিনা" (অন্তর বা হৃদয়) ও "সফিনা"-র (গ্রন্থ, যথা কোরান) পার্থক্য মানতেন। মানতেন যে সাধনার বা বিশ্বাসের একটি অংশ জাহির (প্রকাশ্য) আরেক অংশ "বাতুন" (গোপন)। তিনি লিখেছিলেন :

শরিয়তের দলিল হইল মারুফত বাতনে রইল।

সেইজন্য শরিয়তের সাধনা প্রকাশ্য; হজ-রোজা-নামাজ-জাকাত ও কলমার উচ্চারণ তো নিবিড় বিশ্বাসের প্রকাশ্য রূপায়ণ। তাতে গোপনতা নেই, নিভৃতিও নেই। কিন্তু মারফতি সাধনা নিভৃত, আত্মস্থ ও গোপন, কেননা তার অনেকটাই নরনারীর যুগল দেহকে আশ্রয় করে সাধ্য। লালন মারফতি সাধনার অনন্যতা বুঝিয়েছেন অসামান্য চতুর উপমায় :

চোরে যেমন চুরি করে
ধরে ফেললে দোষে পড়ে—
মারুফতি সেই প্রকারে
চোরা মালের তেজারতি।
সেইজন্যেতে কর গোপন
অনুমানে বুঝলাম এখন
লালন বলে এসব যেমন
মেয়েলোকের উপপতি ॥

উপমান্তরে লালন বুঝিয়েছেন শরিয়ত গাছ, মারফত ফল। শরিয়তে জন্ম হলেও কর্ম হল মারফত। বারে-বারে বলেছেন :

লিখতে জানলে ভজন হয় না
পড়তে জানলে ভজন হয় না।

লালনের গানে কেবলই এক ভেতর দিকে টান দেখি, এক অন্তঃস্রোতের অতলের আহ্বান। বস্তুর বিমিশ্রণ থেকে সার নিষ্কাশনের ঝোঁক। তাঁর শরিয়ত আর মারফতের যৌগ থেকে তিনি সত্যকে ছেনে আনেন এই উৎপ্রেক্ষায় যে,

শরিয়ৎ আর মারফৎ যেমন
দুগ্ধেতে মিশালে মাখন,
মাখন তুললে দুগ্ধ তখন
ঘোল বলে তাতো জানে সবায় ॥

এ পদের যুক্তি অনুসরণ করলে বোঝা যায় শরিয়ত ও মারফতের বিমিশ্রণে শরিয়ত পড়ে থাকে ঘোলের মতো মূল্যহীন। আরেক অসামান্য উপমায় শরিয়তকে লালন বলেছেন আবরণ ("সরপোষ"), তা যেন মারফতের আবরণী বস্ত্র, তাই—

শরাকে সরপোষ লেখা যায়
বস্তু মারুফৎ তাইতে ঢাকা রয়।
সরপোষ নিই তুলে
কি দিই গো ফেলে
লালন বস্তুভিখারি ॥

মূল বস্তু মারফত, তাকে গোপন করার আবরণী হল শরিয়ত। সেই আবরণ তুলে নিলে বা ফেলে দিলে যা পড়ে থাকে সেই পরম বস্তুর ভিখারি লালন ফকির।

এইবারে লালনকেও আমরা পেয়ে যাই আবরণ ছিন্ন করে। তাঁর অস্থিষ্ট আবৃত রয়েছে হিরণ্ময় সত্যের মতো। গোপন আবার আধোপ্রকাশ্য, "জলে যেমন চাঁদ দেখা যায়", যাকে নিজেই তিনি চিনে-চিনে তবু অচিন বলে ডাকেন। বারে-বারে শরিয়তের অবশ্য-করণীয় আচরণবাদের প্রতিবাদ করেও তিনি বলেন :

আগে শরিয়ৎ জানো বুদ্ধি শাস্ত করে।
আসল শরিয়ৎ বলছ কারে ?
কলমা আর নামাজ, রোজা হজ্ব জাকাত
এই পড়িয়ে আদায় কর শরিয়ৎ।
আমি ভাবে বুঝতে পাই
এসব আসল শরিয়ৎ নয়
শরিয়তের অন্য অর্থ থাকতে পারে॥

কী সেই অর্থ, যা আমাদের অজানা ? তবে কি এতদিন শরিয়ত বলতে কেবলই উপাসকরা তৈরি করে গেলেন উপাস্যের সামনে এক কর্মের ও ছলের আড়াল ? ফুলের মালা, দীপের আলো, ধূপের ধোঁয়ার ব্যবধানে আরেক উচ্চবর্গের গীতিকার একদা উপাস্যকে খুঁজে পান নি। স্বরের বাণী তৈরি করেছিল অস্বচ্ছতা। একজন নিম্নবর্গের লোকজ সাধক-গীতিকারও কি সেই অস্বচ্ছতাকে ভেদ করে পৌঁছোতে চান নিজের অনুভূত সত্যে ? সেইজন্যই কি তিনি নামাজ, রোজা, তীর্থ, বৈরাগ্য, কুহক ও অলৌকিককে পেরিয়ে ধরতে চান শুধু মানুষকে ? তবু শেষ পর্যন্ত মানুষই থেকে যায় লক্ষযোজন ফাঁকের অসীমে অপ্রাপণীয়তায়। লালন বোঝেন : 'এই মানুষেই মানুষ আছে / মানুষ ধরা বিষম দায়'। তাই বলে তাঁর আপনাকে জানা ফুরায় না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

উল্লেখ্যপঞ্জী :

১. বাউল একটি ফেতনা। আল-জামীয়-২। সম্পাদক : ম. আতিয়ার রহমান। কুষ্টিয়া, ১৯৮৬। পৃষ্ঠা ৩-৪

২. নারীভক্ষনকারী বাউল লালন শাহ : ম. আ. সোবহান। সাপ্তাহিক ইস্পাত। কুষ্টিয়া, ১৬ নভেম্বর ১৯৮৯। পৃষ্ঠা ৭

৩. বাউল একটি ফেতনা। পৃষ্ঠা ৯

৪. জ্ঞান-সিন্ধু বা গঞ্জে-তত্ত্বহিদ। ৩য় সংস্করণ।

৫. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। পৃষ্ঠা ২০-২১

৬. দ্রষ্টব্য. নারকেলবেড়ের জঙ্গ : তিতুমীর। গৌতম ভদ্র। ১৯৯০। পৃষ্ঠা ৭৪

৭. রফিউদ্দিন আহমেদের The Bengal Muslims 1827-1906 বইতে লেখা আছে : 'The word "Mullah" is literally a Persian form for the Arabic "Maulavi", meaning a learned man, or a scholar. In Bengal, however, the word mullah is ordinarily associated with a class of rural "priests", who are considered inferior in education and status to the better qualified "maulavis" and maulanas'. তাঁর বইতে উদ্ধৃত কাঠমোল্লার বর্ণনা এইরকম :
কাঠমোল্লা এক জাত। আছে দেব ডুনিয়াত
দেস্তার বান্দিয়া ছির পরে।
কার রোগ হইলে পরে মোল্লায় হাজিরা করে
বলে : ঠিক ভাইনি নজর।
মোল্লা বলে টাকা লেও কালা একটা মুরগি লেও
তাবিজেতে যাইবে বেরাম।

৮. বাউল ধ্বংস ফৎওয়া। পৃষ্ঠা ৪-৮

৯. The Journal of the Anthropological Society of Bombay. Vol. 5, No. 4, 1900. p 204

কুরুভিলা জ্যাকারিয়া ও এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজের শতবর্ষ উপলক্ষে তদানীন্তন অধ্যক্ষ কুরুভিলা জ্যাকারিয়া-রচিত "হুগলী কলেজের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। এগারো আনা দামের সরকারি প্রেসে ছাপা এই বইটি এখন দুষ্প্রাপ্য। ১৯৯০-এর ২৪শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ জ্যাকারিয়ার জন্মের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে হুগলী মহসীন কলেজের অধ্যক্ষ ড. বসন্তকুমার সামন্ত অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার রচিত ইতিহাস-বইটির পুনর্মুদ্রণ করেছেন এবং সেই সঙ্গে ১৯৩৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত হুগলী মহসীন কলেজের (১৯৩৭ খ্রী হুগলী কলেজের নামের সঙ্গে হাজি মহম্মদ মহসীনের নাম যুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়) ইতিহাসও বর্তমান পুস্তকে যুক্ত করেছেন।

অধ্যাপক কুরুভিলা জ্যাকারিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি হুগলী কলেজের (১৯৩০-৩৮, ১৯৪২-৪৪) ও ইসলামিয়া (বর্তমানে মৌলানা আজাদ) কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন এবং শিক্ষা-অধিকর্তা হন। ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ ও বৈদেশিক দপ্তরের ইতিহাস বিভাগেও তিনি উচ্চপদ অলংকৃত করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকরূপেই তিনি কিংবদন্তী হয়ে আছেন। তাঁর ছাত্রদের লেখায় দেখা যায় যে তিনিও সম্ভবত নিজের এই পরিচয়েই সবথেকে তৃপ্ত হতেন।

অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার লেখার সংখ্যা, যতদূর জানা যায়, খুব বেশি নয়। লেখার আকর্ষণ সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন। *The Love of Authorship'* প্রবন্ধের একস্থানে তিনি লিখেছেন, 'Indeed, wedding and writing are like each other. There is a sweet seduction in both, a pleasant thrill, a promise pleasure such as it would be fully to rebuff.'

কিন্তু অন্যত্র তিনি লিখেছেন, 'I have grace enough to be ashamed of the desire to publish.' আজকের 'publish or perish'-এর যুগে বোধ হয় এই মানসিকতা বোঝা যাবে না। কিন্তু, অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার লেখার সংখ্যা কেন কম, তা বোধ হয় অনুমান করা যায়। তিনি খুব সহজে 'seduced' হতেন না। কিন্তু যখন হয়েছেন, তখন তাঁর আকর্ষণের দান এক-একটি রত্নবিশেষ। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে তাঁর অন্যান্য লেখার একটি সংকলন শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। "হুগলী কলেজের ইতিহাস" সম্ভবত তাঁর রচিত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থ। সেই কারণেই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ করে ড. সামন্ত আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

সমালোচিত পুস্তকের প্রথম ভাগে অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার রচনাটি আছে। দ্বিতীয় ভাগে তিনটি অধ্যায়ে ড. রাধামাধব সাহা, ড. বসন্তকুমার সামন্ত ও ড. দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র ১৯৩৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত হুগলী মহসীন কলেজের ইতিহাস রচনা করেছেন।

Origin and Development of An Institution of Higher Education : A History of Hooghly Mohsin College by K. Zachariah. Edited by Dr. B. K. Samanta. Sahityaloke. Calcutta, 1991, Rs. 150.

অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার হুগলী কলেজের ইতিহাস ছটি অধ্যায়ে ভাগ করে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া, পরিশিষ্টে হাজি মহম্মদ মহসীনের ট্রাস্ট-দলিল এবং হুগলী কলেজের জন্য মেকলের আদি পরিকল্পনা ছাপা আছে। এ ছাড়া বিস্তৃত সূত্রনির্দেশও আছে। হুগলী কলেজের জন্মবৃত্তান্ত থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত শতবর্ষের ইতিহাস তাঁর লেখায় ধরা আছে। এই ইতিহাস একটি কলেজের ইতিহাস, কিন্তু এক পক্ষে এটি সে যুগের শিক্ষার এবং বুদ্ধির ইতিহাসও বটে। অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার লেখায় বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সব সময়ই উপস্থিত। তাই হুগলী কলেজের বিবর্তনের সঙ্গে বাঙলার শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাসও সহজেই অনুমান করা যায়। সরকারি নথিপত্র, কলেজের চিঠিপত্র ও রক্ষিত নথি, সংবাদপত্র—সমস্ত সূত্রই তিনি ব্যবহার করেছেন। তাঁর Bibliographical Note থেকে তাঁর সূত্র-ব্যবহারের পরিকল্পনা জানা যায়।

হুগলী কলেজের সূচনার কথা লিখতে গিয়ে তিনি মূলত কলকাতা-কেন্দ্রিক শিক্ষার বিকাশ ও সামাজিক সংস্কার সম্পর্কিত নতুন ধ্যান-ধারণার কথা যেমন লিখেছেন, তেমনই একদা-সমৃদ্ধ বন্দর-শহর হুগলীর কথা, সেখানকার বহিরাগত মুসলমান ব্যবসায়ী সমাজ ও মুঘল যুগের সমাজেরও উল্লেখ করেছেন। হাজি মহম্মদ মহসীন এই সমাজেরই প্রতিনিধি। তাঁর বিশাল সম্পত্তি তিনি একটি অছির হাতে দিয়ে যান। এই অছি নিয়ে পরবর্তী কালে মামলা, অছির দায়িত্ব সরকারের হাতে আসা এবং উদ্বৃত্ত অর্থে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিভাবে বিভিন্ন প্রস্তাবের সমন্বয় ঘটিয়ে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল, কিভাবে পাঠ্য-সূচি, শিক্ষক ইত্যাদির ব্যবস্থা হল—এসব কথাই তাঁর পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে কলেজের বিবর্তন-ক্রমোন্নতির ইতিহাস বলা হয়েছে। কোনো সময়েই অধ্যাপক জ্যাকারিয়া শিক্ষা ও সমাজের বৃহত্তর ছবিটি হারান নি। তাই এই রচনায় হুগলী-চুঁচুড়া অঞ্চলের নতুন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কথা যেমন আছে, তেমনই ছাত্রদের পড়াশোনা ও পরীক্ষার কৃতিত্বেরও অত্যন্ত বিস্তারিত বিবরণ আছে। আমরা জানতে পারি যে কলেজ শুরুর পরের বছরেই প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা 'read and explained an unfamiliar passage from Milton.'

প্রায় প্রথম দিকেই উচ্চশ্রেণীর যে পাঠ্য-তালিকা, তা আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তালিকাটির দিকে এক নজর তাকাবার লোভ সংবরণ করা মুশকিল: History of England, Modern Europe, History of India, Bacon's Essays, Richardson, Poetical Selections, Algebra, Integral and Differential Calculus, Spherical Trigonometry, Astronomy, Mechanics, Hydrostatics. Optics, Hydrolics Pneumatics Drawing and Perspective, Mechanical and Architectural Drawing, Practical Surveying, Translation from vernacular into English, English Composition, Bengali Composition, Translation and Grammar, Sanskrit Grammer & Composition ইত্যাদি। তখন শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত অর্থেই শিক্ষিত করা।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্বভাবতই তাঁর দুর্বলতা ছিল। তাই গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিবর্তনের একটা ছবিও পাওয়া যায়। হুগলী মহসীন কলেজের গ্রন্থাগার আজও বহু দুর্লভ গ্রন্থের আকর। অধ্যাপক জ্যাকারিয়া গ্রন্থা-গারের প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ, পুরনো সাময়িক পত্র ও মানচিত্রের তালিকাও লিখিতভাবে দিয়েছেন। ১৯৩১ সালে গ্রন্থাগারে প্রায় একাশি হাজার বই ছিল। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। ১৮৯৪ সালে প্রাদেশিক গবর্নর 'Notes and Queries' ও 'Educational Times' কলেজের জন্য রাখার অধ্যক্ষের প্রস্তাব বাতিল করে দেন। কারণ এগুলি অন্য কোনো কলেজের জন্য কেনা হত না। কিন্তু ১৮৭৯ সালে প্রাদেশিক গবর্নর হুগলী কলেজকে বাঙলা পঞ্জিকা কেনার জন্য তিন আনা মঞ্জুর করেছিলেন—মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মফসসল কলেজ হিসেবে হুগলীর মতো সরকারি কলেজগুলির যে অসুবিধা ছিল, অধ্যক্ষ-রূপে জ্যাকারিয়া তা ভালোভাবেই জানতেন। তাঁর লেখায় তাই দেখি যে, ১৯০৭-এর পরে মফসসল কলেজ সম্পর্কে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল এবং জ্যাকসন কলেজ পরিদর্শন করে লিখেছিলেন যে, মফসসল কলেজের অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ, তাঁর মতে, 'the increased amount of attention paid to the Presidency College'.—মন্তব্যটি সম্ভবত আজও প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে কলকাতার ও মফসসল কলেজের প্রতি সরকারি মনোযোগের তফাতের দিক থেকে। কিন্তু আরও উল্লেখযোগ্য বোধ হয় সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি প্রকৃত সরকারি মনোযোগের অভাব।

শিক্ষকদের বেতনক্রম, সিভিল সার্ভিসের তুলনায় তাঁদের অবস্থা ও বেতন অন্তত কিছুটা বাড়ার ফলে অকসফোর্ড এবং কেমব্রিজ থেকে মেধাবী যুবকদের শিক্ষক হিসেবে আসা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়েই তিনি মনোযোগ দিয়েছেন। তখনকার শিক্ষকদের বেতন অবশ্য আজকের শিক্ষকদের ঈর্ষার কারণই হবে। কলেজের খেলাধুলার কথাও বাদ পড়ে নি। শেষে অধ্যাপক জ্যাকারিয়া লিখেছেন যে দেওয়াল, চেয়ার-টেবিল বা যন্ত্রপাতি দিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি হয় না। এর কেন্দ্রে আছেন শিক্ষক ও ছাত্র। তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর অনবদ্য গদ্যে, তাঁর গভীর ইতিহাসবীক্ষায় অধ্যাপক জ্যাকারিয়া এই সামগ্রিক বিপর্যয়ের চেহারাটাই তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপিত করেছেন। আক্ষেপ থাকে যে তাঁর এই ইতিহাসবোধ যদি ভারতবর্ষের ইতিহাসের আরও কিছু অংশের ওপরে পড়ত, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম আরও সমৃদ্ধ হত।

অধ্যাপক জ্যাকারিয়া-রচিত একশ বছরের ইতিহাস নিয়েছে ১২৫ পৃষ্ঠা, পরবর্তী চুয়ান্ন বছরের ইতিহাসের জন্যে বরাদ্দ ছত্রিশ পৃষ্ঠা। সুতরাং পরবর্তী অধ্যায়ের লেখকদের লেখার ক্যানভাস স্বভাবতই ছোটো। স্বল্প পরিসরে প্রায় চুয়ান্ন বছরের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ তাঁরা দিয়েছেন। সম্পাদক মুখবন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন: অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার লেখায় স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই।

ড. সাহা ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ সালের যে ইতিহাস লিখেছেন, তাতে স্বাধীনতা আন্দোলন আর রাজ-নীতির সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক বিষয়ে জানা যায়। ১৯৩৭-এর এপ্রিলে ছাত্র-ধর্মঘট বা ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ভূমিকা তিনি আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ-বিষয়ে একটি পৃথক পরিশিষ্ট রচনা করলেই বোধ হয় কানাইলাল দত্ত বা জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের মতো মানুষদের স্মৃতির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হত। ড. সাহার লেখায় খুব চিত্তাকর্ষক কিছু ঘটনারও উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে শিক্ষকরা একদিনের বেতন দান করে-ছিলেন। জেলাশাসকের স্ত্রী যুদ্ধের কাজে সহায়তার জন্যে একটি কমিটি তৈরি করেছিলেন এবং অধ্যাপক-দের স্ত্রীদের সেই কমিটিতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁরা কেউ যান নি, কিন্তু তার ফলে বিভাগীয় কমিশনার সাহেব রুষ্ট হয়ে অধ্যক্ষকে লেখেন, অধ্যক্ষ শিক্ষকদের কাছ থেকে এর কারণ জানতে চান। এ নিয়ে বিক্ষোভের সঞ্চার হলেও, শিক্ষকদের উদ্ধৃত পত্রে বেশ নরম মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়। বিমান আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতিপর্বেও যোগ দেওয়া নিয়ে বেশ সমস্যার সৃষ্টি

হয়েছিল। কিন্তু, প্রতিরোধ তৈরি হয়েছিল এমন ধারণা করা যায় না। এই সময়ে কলেজে মুসলমান ছাত্রদের অনুপাত, কলেজের বাৎসরিক খরচ, গ্রন্থাগার বা ছাত্রদের কমনরুমে রাখা সাময়িকপত্রের তালিকাও ড. সাহা দিয়েছেন।

১৯৪৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত কলেজের বিবর্তনের ইতিহাস লিখেছেন ড. সামন্ত। স্বাধীনতা ও দেশ-ভাগ এ সময়ে বড়ো ঘটনা। তার প্রভাব কলেজের ওপরেও পড়েছিল। মুসলমান ছাত্রদের অনুপাত কমে গিয়েছিল। কিন্তু ছাত্রদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৪৬-৪৭ সালে ছাত্রসংখ্যা ৪৮১; ১৯৫৯-৬০-এ ৭০২ এবং ১৯৯০-এ আইন-বিভাগ সমেত মোট ২০৯২। অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার আশঙ্কা যে কলেজটির কলেবর বৃদ্ধি হবে না—ড. সামন্ত দেখিয়েছেন,—সত্যে পরিণত হয় নি।

অবশ্য পরের অধ্যায়ে গত তিন দশকের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ড. দেবেন্দ্রবিজয় মিত্র অবনতির ওপরেই জোর দিয়েছেন। অধ্যাপক মিত্র খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। বাঙলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর তাঁর গবেষণা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

১৯৬০-এ একটা বড়ো পরিবর্তন হয়। কলেজটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ে স্নাতকোত্তর, পঠন-পাঠন শুরু হয়। কিন্তু মূল ছবিটি অবনতির। ড. মিত্রের মতে, এর কারণ ষাটের দশকের শেষের ছাত্র-আন্দোলন (সি. পি. আই. এম. এল-এর প্রভাবাধীন) এবং তার ধ্বংসলীলা, কলেজের অপরিকল্পিত প্রসারণ (আইন, বাণিজ্য ও প্রাতঃকালীন বিভাগ খোলা), ফলে স্থানাভাব, অনিয়ন্ত্রিত ছাত্র ভরতি ও ছাত্রীদের ভরতির ওপর বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া। শেষে বর্ণিত কারণটি নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু অন্য কারণগুলি অনেকাংশেই সত্য। কিন্তু ছাত্র-আন্দোলনের বৃহত্তর সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তিনি আদপেই আলোচনা করেন নি বা সত্তরের শেষে ও আশির দশকে হুগলী কলেজে যে বর্ণের রাজনীতি কলেজকে গ্রাস করেছে তারও উল্লেখ করেন নি। তাই, ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কিছু রূঢ় ভাষণ সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস-বিশ্লেষণ মনে হয় নি। বরঞ্চ মনে হয়েছে লেখকের মনের ছাপ বড়ো প্রবল। এ ছাড়া শিক্ষকদের অনিয়মিত ক্লাশ নেওয়া বা শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সংঘবদ্ধ হওয়া ও কলেজ পরিচালনার ওপরে তার প্রভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেন নি। বোধ হয় বলা যায় যে, রাজনীতি শুধু ছাত্ররাই করেন না। তাই সামগ্রিক বিশ্লেষণ ছাড়া কলেজের অবনতির কারণ খুব স্পষ্ট বোঝা যায় না। আর-একটা কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করছি। পঞ্চাশ বা ষাটের দশক পর্যন্ত যে অবস্থা ছিল, তার তুলনায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আবহাওয়া এখন অনেক বেশি গণতান্ত্রিক। তার ফলে লাভ হয়েছে না ক্ষতি হয়েছে,—না দুটোই কিছু পরিমাণে, তার আলোচনা হলে বোধ হয় বিভিন্ন আন্দোলনের প্রভাব ভালো বোঝা যেত। এবং সম্ভবত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিবেশ বোঝার পক্ষে সহায়ক হত। জ্যাকারিয়ার সময় থেকে মিত্রের সময়ের ফারাক খুব স্পষ্ট; কিন্তু কারণ এই বইতে পাওয়া যায় না। সমসাময়িক ইতিহাসের পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ সহজ নয়, কিন্তু অন্তত নজরে পড়লেও খুশি হওয়া যেত।

আসলে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সূচনা, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থার নিছক বিবরণ ইতিহাস হয় না। হুগলী কলেজের শতবর্ষোত্তর বিবর্তনের একটা সন্তোষজনক চেহারা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পেয়েছি; কিন্তু অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার লেখার বৃহত্তর সামাজিক, বৌদ্ধিক প্রেক্ষিতটি পেলাম না। এক সময়ে হুগলী নদীর দুপারেরও বহু ছাত্র হুগলী মহসীন কলেজে পড়েছেন এবং কলেজের প্রতি মমতা আর আবেগ বোধ করেছেন। আজ বোধহয় এই বন্ধনটি অনেক শিথিল হয়েছে; কিংবা হয়েছে কি? প্রশ্নটি বা তার উত্তর—কোনোটিই পরিবর্ধিত বইতে নেই। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ক্যাম্পাসের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্ক আচরণ, জীবন ও শিক্ষার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন, পাঠক্রমের বিবর্তন, পড়ার অভ্যাস, গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ এবং তার সদ্ব্যবহার—এসব মিলেই একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জীবন তৈরি হয়। আমরা কিন্তু কাঠামোটাই পেলাম, ভেতরের মনটা পেলাম না। আজকাল ঐতিহাসিকরা এদিকটাতেও নজর দিচ্ছেন। অনুমান করি, বর্তমান লেখকেরা একটু তাড়াহুড়ো করে লিখেছেন। সেকথা অবশ্য সম্পাদকমশাই লেখেন নি। জ্যাকারিয়া তাঁর মুখবন্ধে তাঁর কাজের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন; এ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয়, তাঁর কাজ অনেকাংশেই সম্পূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী যুগের ইতিহাস রচনায় তাঁর নিষ্ঠার অনুসরণ নিশ্চয়ই কাম্য হত। এত কথা বলার পরেও সম্পাদককে সাধুবাদ জানাতেই হয়। তিনি প্রয়োজনীয় দুটি কাজ করেছেন: এক অধ্যাপক জ্যাকারিয়ার জন্মশতবর্ষে তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন; দুই. এদেশের পুরনো শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ঘিরে শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস যে জরুরি—এ কথাটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আশা করা যায়, অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং পরবর্তী প্রজন্ম এদিকে দৃষ্টি দেবেন। তাই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সম্পাদক এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রয়াস অভিনন্দন-যোগ্য।

গানজাগানিয়া

বিশ্বজিৎ রায়

"বাংলা গানের সন্ধানে" আমি ঠিক যে আশা নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, তা যে পূরণ হবে না – তা বইটির কিছুটা পড়ার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম। এর জন্যে অব্য আমি নিজেই দায়ী। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে কথা আর সুরের মিলনে যে বাঙলা গান বহু বছর ধরে রূপ নিয়ে এসেছে, তারই এক সামগ্রিক বৃত্তান্ত সুধীর চক্রবর্তী তুলে ধরবেন। ভূমিকা এবং বিষয়ক্রমটিতে আগে মনোযোগী না হয়ে সরাসরি প্রথম প্রবন্ধটিতে মনোনিবেশ করার ফলেই এই আশাভঙ্গ। কারণ ভূমিকাতে—লেখকের ভাষায় 'আত্মপক্ষ'-এ—সুধীর চক্রবর্তী সুস্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই গ্রন্থে তিনি কোনো-কোনো বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই আলোচনাদি তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে পরিবেশিত তথ্য, তত্ত্ব এবং মন্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিলেই বাঙলা গানের সন্ধানে নেমে তিনি কী দেখেছেন এবং পেয়েছেন, তার সার্বিক পরিচয়টি পাওয়া যাবে। আমার দুর্ভাগ্য যে, বাঙলা গানের নানা বিষয় নিয়ে সুধীর চক্রবর্তী যে বেশ কয়েকখানি বই লিখেছেন, তা আমার পড়া নেই।

তবুও এই কথা কবুল করতে আমি বাধ্য যে কয়েকটি দিক থেকে সীমিত থাকা সত্ত্বেও সুধীর চক্রবর্তীর আলোচনাদি অনেকাংশে নতুন এবং মূল্যবান। বইটির প্রথম খণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা গান যে নানা দিকে নতুন ছাঁদে সমাজে প্রবেশ করল তার একটি ব্যাপক এবং বিচিত্র ইতিহাস লেখক পেশ করেছেন তিনটি প্রবন্ধে। বাঙলার এই নবযুগের গানে কোনো-কোনো সামাজিক প্রবণতা এবং চাহিদা এবং সেই সঙ্গে কোনো-কোনো ব্যক্তিগত প্রতিভার দান মিলিত হয়েছিল। এক কথায়, সেই বাঙলার নবজাগরণের কালে এই দেশে সঙ্গীতের সংস্কৃতি কীভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছিল তার এক সুবৃহৎ এবং স্মরণীয় ছবি সুধীর চক্রবর্তী এঁকেছেন। এর মধ্যে তাঁর নিজস্ব গভীর সঙ্গীত এবং সমাজবোধ আর অসাধারণ শ্রমশক্তির প্রশংসনীয় পরিচয় রয়েছে। উপরোক্ত গুণগুলি তাঁর আছে বলেই বাঙলার নবজাগরণের গানের এবং পশ্চিম ইউরোপের বিশেষত ইংল্যানডের

বাংলা গানের সন্ধানে—সুধীর চক্রবর্তী। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬। ত্রিশ টাকা।

রেনেসাঁসের (রানী প্রথম এলিজাবেথের) যুগের একটা তুলনার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ইংল্যানডে এই সময়ে দেশী বা লোকগীতির (ফোক সং-এর) পরিবর্তে দেখা দিল আর্ট সং। ফোক সং-এর স্বতঃস্ফূর্ততা আছে তাকে বাদ দিয়ে আর্ট সং হয়ে উঠল নাগরিক পরিবেশে—ইতিহাসে ড্রইংরুম কথাটির ব্যবহার আছে—একেবারে সুপ্রথিত কমপোজ-করা গান। এর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দী থেকে দেশী বা লোকগীতির থেকে পৃথক যে প্রবদ্ধসঙ্গীত বাঙলায় এবং কলকাতায় দেখা দিল তাকে আর্ট সং-ই বলা চলতে পারে। আর্ট সং-এ আবার যখন লোকগীতির সাংস্য এবং সংবেদনশীলতা দেখা দিয়েছিল, তখন তার নাম হয়েছিল ভোকশ্‌লিক বা ফোক-লাইক যা অনায়াসেই "ওহে জীবনবল্লভ" প্রভৃতি রবীন্দ্রসঙ্গীতের এবং বহু ব্রহ্মসঙ্গীতের বর্ণনা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলে নিতে হয়। ব্রহ্মসঙ্গীত বলতে যেন মনে হয় লেখক আদি ব্রাহ্মসমাজের জন্য রচিত গানকেই বুঝেছেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলকাতার বাইরে এবং বিশেষত পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্ম-আন্দোলনকে পৌঁছেছিলেন এবং বাঙলা গীতরচনায় এক নতুন অনুপ্রেরণা জাগালেন, তার জন্য হাজার-হাজার নতুন এবং অপূর্ব গান বাঙলায় রচিত হয়েছিল। সেই গানে যেমন ছিল কীর্তন-বাউল ইত্যাদির ধারা, তেমনি ছিল মার্গ-সংগীতে প্রচলিত অসংখ্য রাগের ভিত্তি। কিন্তু বাঙলা গানের এই বিপুল এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সুধীর চক্রবর্তীর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। এই ব্রহ্মসঙ্গীতের সামান্য অধ্যয়নই প্রমাণ করবে যে উনবিংশ শতকের নতুন বাঙলা গান সর্বাংশে "এলিটিস্ট" হয়ে ওঠে নি।

সুধীর চক্রবর্তীর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে যে সব নবভাবনা ও নবপ্রয়াস ঘটেছিল' সেগুলির বৃত্তান্ত তিনি দিয়েছেন সুচিন্তিত ভাবে-তাদের চরিত্র এক, দুই, তিন করে ক্রমিকভাবে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকাদির প্রকাশ এবং প্রামাণিক কোষগ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদের বিষয় দুটি। এতে লেখকের জ্ঞানের এবং পরিশ্রমের সবচেয়ে প্রশংসনীয় পরিচয় রয়েছে। এই কালে কোনো-কোনো সঙ্গীতরচয়িতা, সংগীতবোদ্ধা এবং গায়ক বাঙলা গানের দিগন্তকে বিস্তৃত করেছেন, তারও সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ লেখকের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। "পুরানো কলকাতার গান" প্রবন্ধটি—লেখককে অনুরোধ করব এটিকে একটি পুরো গ্রন্থে পরিবর্তিত করতে—যেমন তথ্য তেমনি যুক্তি-সমৃদ্ধ সিদ্ধান্তে অত্যুজ্জ্বল। নিধুবাবুর শুধুমাত্র গীত-রচনার প্রেরণার জন্য একটি বিশেষ গণিকার গৃহে গমন এবং তার ফলস্বরূপ একক প্রেমগীতির রচনায় আবিষ্ট হওয়া, এবং এই রচনার দীর্ঘকালীন ফল—এই সবই অদ্ভুত আমাকে দুর্লভ জ্ঞান সরবরাহ করেছে। "গান-জাগানিয়া"-তে বাঙলা গানের বিবর্তনে সংগীতরসবেত্তা এবং সমালোচকরা গীতিকার এবং গায়ক আর গায়িকা-দের কীভাবে এবং কতটা সহায়তা করেছেন তার এক ভাববার মতো চিত্র দিয়েছেন। লেখককে সাধুবাদ যে তিনি বেশ দীর্ঘভাবেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরীর লেখা থেকে তাঁর উদ্বৃদ্ধিতগুলি খুবই প্রয়োজনীয় বলে ঠেকবে যে-কোনো গাইয়ে বা রচনাকারদের কাছে। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব ভঙ্গিতে বাঙলা থিয়েটারের কনসার্টের সমালোচনাটি হয়তো দেওয়া যেত। সেটি এই রকম : 'তখনো ড্রপ সিন ওঠে নি, সবে কন্‌সার্ট শুরু হয়েছিল; বেহালাগুলো সব সমস্বরে চিঁ-চিঁ করছিল, cello গ্যাঙরাচ্ছিল, bass viola থেকে হুংকার ছাড়ছিল, এবং double bass দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁক্কাহোঁক্কা করছিল।' এরপর এ-ও আছে : '…তখন একটি স্থূলাঙ্গী বয়স্কা গায়িকা অতি মিহি, অতি-নাকি এবং অতি-টানা সুরে একটি গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সে তো গান নয়, ইনিয়ে-বিনিয়ে নাককান্না।'

সুধীর চক্রবর্তী তথাকথিত আধুনিক বাঙলা গানের

ওপরে বেশ বড়ো করে, সুযুক্তিসহকারে এবং যথেষ্ট সাহস নিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার মূল্য এই বইয়ের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি। কোনো-কোনো মনোবৃত্তি, সামাজিক ব্যাধি এবং রসবোধের অভাবে এই ধরনের গান অনেকের কাছে অস্পৃশ্য হয়ে আছে, তার অনেকগুলিই তিনি উত্থাপন করেছেন। তিনি এই আধুনিক গানের অধিকাংশের সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর থিয়েটারের গান সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বর্ণনাটি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারতেন। করেন নি সম্ভবত এইজন্যে যে গানের সুর, গানের গায়কি ইত্যাদিকে তিনি সযত্নে বাদ দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর লেখার এই সীমাবদ্ধতার ফলে গানের আলোচনা সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিক গানের শোকাবহ দিকটির একটি কারণ যে স্কুল-কলেজে সঙ্গীতশিক্ষাকে আবশ্যিক করে সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয় নি স্বাধীনতার চল্লিশ বছর এবং পশ্চিমবঙ্গে বাম ফ্রনটের রাজত্বের চোদ্দ বছর পেরোনোর পরেও, তা ভাবার বোধহয় দরকার ছিল। যে সামাজিক অবস্থায় তিরিশের দশকের প্রায় সব আধুনিক কবিই ইংরেজির ছাত্র ছিলেন, কিন্তু ছিলেন না গানের শিক্ষায় শিক্ষিত—তা-ও আধুনিক বাঙলা গানের ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য। এই গানের প্রতি শ্রোতাদের আকর্ষণ একটা এবং একটা রচয়িতা আর গায়কদের মনঃপ্রকর্ষের মান তা হয়তো বোঝা যেত যদি সত্যজিৎ রায়কে একজন বিচারযোগ্য সঙ্গীতকার এবং গীতিকার বলে ধরে নিয়ে তাঁর "গুপি গাইন বাঘা বাইন"-এর এবং "হীরক রাজার দেশে"-র গানের আশ্চর্য জনপ্রিয়তার কারণ সন্ধান করা হত। বলা বাহুল্য, শেষের এই অনুচ্ছেদের সব কিছুই লেখা হল সুধীর চক্রবর্তীর লেখার মূল্য যথেষ্ট বলে। তিনি ভবিষ্যতেও তাঁর দুর্লভ সঙ্গীতচেতনার বৃহত্তর পরিচয় দেবেন—এই বিশ্বাস রইল।

উনিশ শতকের গীতিকাব্য এবং বাঙলা কাব্যে "রূপের পূজারী" কবিকে নিয়ে গবেষণা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের বাঙলা সাহিত্যে উনিশ শতক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণার অন্ত নেই। গতানুগতিক বাঙালি জীবনে আর সমাজে উনিশ শতক যেন এক কলোসাস —যার আবির্ভাব অফুরন্ত বিস্ময় আর প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। সেই স্মরণীয় উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা গর্বিত। তাই উনিশ শতক নিয়ে যে-কোনো আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ আমাদের মনে আগ্রহ এবং কৌতূহল সৃষ্টি করে।

শ্রীমতী গীতা পালের "উনিশ শতকের গীতি-কবিতা" বইটি আমরা পেয়েছি। প্রচ্ছদের পিছনে লিখিত পরিচয় থেকে জানা গেল, আশৈশব গীতা দেবী লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুনীতিকুমার প্রমুখ মহীরূহতুল্য ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য ও স্নেহ তিনি পেয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর গবেষণার ফসল—যা রচিত হয়েছিল ১৯৫৪-৬৫ সালে। মুখবন্ধে আজহারউদ্দীন খান লিখেছেন : 'বইটি পড়ে মনে হবে লেখিকা জানেন অনেক কিছু, প্রকাশ করেন অনেক কম কথায়।' নিঃসন্দেহে এটি ভালো গুণ। অষ্টাদশ শতকের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রও বলেছিলেন, 'পড়িয়াছি যেইমতো লিখিবারে পারি।—কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি।' দুঃখের বিষয় এই, যা ভারতচন্দ্রকে মানায়, অন্যের ক্ষেত্রে তা বেমানান। যেহেতু উনিশ শতক

উনিশ শতকের গীতিকবিতা গীতা পাল। প্রকাশনা, মেদিনীপুর। পঁচিশ টাকা। **কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন—জীবন ও কাব্য**—বীরেনকুমার চট্টোপাধ্যায়। অনন্ত প্রকাশন, কলকাতা। পঁয়তাল্লিশ টাকা।

মহাকাব্যতুল্য যুগ—তাই তার বিচার-বিশ্লেষণ দু-এক কথায় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। তাতে অনেক কিছুই অস্পষ্ট থেকে যায়। এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লেখিকা অতিদ্রুত উনিশ শতকের গীতিকাব্যের ধারার রেখাচিত্র এঁকেছেন, কখনোই বিস্তারিত আলোচনা মূল্যায়ন বা উপভোগের পরিচয় দেন নি। তিনি মন্তব্য করেছেন, উদ্‌ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু কবিতার গভীরে প্রবেশ করেন নি। যেমন, মধুসূদনের "মেঘনাদবধ" কাব্যটি লেখিকার মতে, রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধবিষয়ক কাব্য, চতুর্থ সর্গটি লেখার কারণ, কবির 'গীতিকবিসত্তাটি কাজ করেছিল'। নচেৎ সর্গটি অপরিহার্য ছিল না। "বৃত্রসংহার"কে সেকালের মতানুসারে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছিল, লেখিকা সে মতের বিরুদ্ধে যান নি। নবীনচন্দ্রের "ত্রয়ী"-কাব্যের অন্তর্গত গীতিরসে তিনি আপ্লুত হয়েছেন। অথচ এগুলি মহাকাব্য কেন হল না, গীতিকাব্যধর্ম কী ক্ষতি করল, তার আলোচনা করলেন না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পাশ্চাত্য কাব্যসাহিত্য পাঠে বাঙালিকে আকৃষ্ট করলেও স্বয়ং সেই কাব্যভাবনা ও কাব্যরীতি যে গ্রহণ করতে পারেন নি, লেখিকা তা আলোচনা করেন নি। বরং রঙ্গলালের মধ্যে 'নব-রোমান্টিক কবিত্ব' আবিষ্কার করে তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছেন। অথচ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "স্বপ্নপ্রয়াণ" কাব্যপ্রসঙ্গে তাঁর মিতকথন কাব্যটির প্রতি সুবিচার করে নি। বিহারীলালের রোমানটিকতার তুলনায় দ্বিজেন্দ্রনাথ যে কম রোমানটিক ছিলেন না—বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলে বোঝা যেত। বিহারীলালের "সারদামঙ্গল"-এর অভিনবত্ব ও অপরূপত্ব লেখিকা বুঝতে পারেন নি। কবির চিঠির স্থূল অর্থ (···ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি।) গ্রহণ করে তিনি বলেছেন, 'উন্মত্তবৎ হয়ে তিনি এ কাব্য রচনা করেছিলেন' বলেই 'কবি যে কি কথা বা কার কথা বলতে চান তা' কাব্যপাঠে বোঝা দুষ্কর-প্রায়।' আমরা এই গবেষণার সঙ্গে সহমত নই।

উনিশ শতকের গীতিকাব্য বা কাব্যচর্চা নিয়ে আমরা এর আগে যেসব বই পেয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের "উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য", এবং উক্ত নামে গীতিকাব্যসংকলনে বিশেষভাবে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকাটি। ড তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের ''আধুনিক বাংলা কাব্য'', ড অলোক রায়ের "বাঙালি কবির কাব্যচিন্তা : উনিশ শতক" ইত্যাদি। ফলে শ্রীমতী পালের আলোচনায় তন্নিষ্ঠ পাঠক খুশি হবেন না। যদিও পাখির নজরে যদি কেউ উনিশ শতকের কাব্যচর্চা সম্পর্কে কিছু জানতে চান, তো, এই বই তাঁদের সাহায্য করবে। পরিশেষে বলি, বইটির প্রচ্ছদ শোভন হলেও, মুদ্রণ ও বানান-ভুল পীড়াদায়ক। লেখিকার গদ্যরীতিও সর্বদা সুখশ্রাব্য হয় নি। গ্রন্থ-পঞ্জির বিন্যাসে মনস্কতার অভাব দেখা গেল, গবেষণা-গ্রন্থের প্রথম শর্তই হল আদ্যন্ত সুসংহতি—এখানে নেই।

ড. বীরেনকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবন ও কাব্য" এটিও গবেষণাগ্রন্থ। বইটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ আকর্ষণীয় নয় ঠিকই, কিন্তু সেসব বাধা অতিক্রম করে বইটির ভিতরে প্রবেশ করলে পাঠক বঞ্চিত হবেন না। বাঙলা কাব্যে "রূপের পুজারী" দেবেন্দ্রনাথ সেন আজ বিস্মৃতপ্রায় কবি। তাঁকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখা হলেও আস্ত বই বা গবেষণা হয় নি। ড. চট্টোপাধ্যায় সে অভাব পূরণ করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। যদিও প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে ড. অধীশচন্দ্র সাহার "দেবেন্দ্রনাথ সেন : জীবনী ও কাব্যবিচার।" দেবেন্দ্রনাথ যে ক্রমশ জনপ্রিয় ও আলোচিত হচ্ছেন, এটি সুখবর। কারণ, রবীন্দ্রপরবর্তী কবিকুলের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখের কবিতায় আমরা যে শরীরবাদী উচ্চারণ, রূপানুরাগ ও নারীবন্দনা দেখি, তার পুরোধা কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেন। কাজেই তাঁকে বাদ দিয়ে বাঙলা কাব্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ড. চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থটিকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে আর ছটি পরিশিষ্টে ভাগ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়টি কবির "কাব্যপরিচয়"—যা আবার তিনটি পর্বে বিভক্ত। বীরেনবাবু অত্যন্ত পরিশ্রমে 'কবি-জীবনী' লিখেছেন। বহু অজানা তথ্য পরিবেষণ করেছেন। সেন-কবির জন্ম-তারিখ-সাল নিয়ে দীর্ঘকাল যে বিতর্ক চলেছিল, তার যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে জানিয়েছেন : 'তাঁর জন্ম-বৎসর ১৮৫৮ সাল।' আরো জানা যায়, কবির পূর্বপুরুষদের উপাধি ছিল মজুমদার এবং 'দেবেন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল ছিলেন একই বংশসঞ্জাত'। তথ্যটি এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, ভোগবাদী কবিরূপে চিহ্নিত মোহিতলালের ঐতিহ্য-সূত্রটি এতে জানা সহজ হয়। 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন' মোহিতলালকে অনুপ্রাণিত করেছিল কেন, তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না।

রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্রানুরাগী হয়ে দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রপ্রভাবিত নন। অন্তত নিজস্ব সুর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ড. চট্টোপাধ্যায় চমৎকারভাবে যুগ, পরিবেশ, ঐতিহ্য বিচার করে দেবেন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের এবং কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এতে দীর্ঘকালের অভ্যস্ত বিচারগুলি ধোপে টেঁকে নি। দেবেন্দ্রনাথ যে স্বকীয়তাভ্রষ্ট নন তা বোঝা গেছে। যদিও রবি-করস্পর্শ সম্পূর্ণভাবে তিনিও এড়িয়ে যেতে পারেন নি; পারা সম্ভব ছিল না। সনেটরচনায় দেবেন্দ্রনাথ এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। বীরেনবাবু অত্যন্ত যত্ন নিয়ে এ বিষয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মধুসূদনভক্ত হয়েও দেবেন্দ্রনাথের সনেট কেন স্বভাবত স্বতন্ত্র। প্রতিটি কাব্য ধরে গবেষক দেখিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় প্রকৃতিপ্রীতি, নারীপ্রেম ও বাৎসল্যরস কিভাবে মূর্ত হয়েছে। শুধু তথ্য আহরণ বা উল্লেখমাত্র নয়, রসনিষ্কাশনেও তিনি রসিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে যে একটি ভক্তমন ছিল তাও তিনি আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বলার আছে। "খৃষ্টমঙ্গল" কাব্যটি আলোচনায় বীরেনবাবু যদি বাঙলা কাব্যে খ্রীষ্টের প্রভাব নিয়ে কিছু কথা বলতেন, তবে তাঁর আলোচনা সর্বাঙ্গসুন্দর হত। কেননা কবি নবীনচন্দ্র সেনও খ্রীষ্টকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আখ্যানকাব্য "অমৃতাভ" লিখেছিলেন। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে ষষ্ঠ অধ্যায়টি 'প্রভাব ও প্রেরণা অন্বেষণ' যে-কোনো পাঠকের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ জাগাবে। আধুনিক কবিদের কাব্যে দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব যে কতখানি, তার রসগ্রাহী আলোচনা ও অন্বেষণ আমাদের ভালো লেগেছে। সুলিখিত অধ্যায়টি দেবেন্দ্রনাথকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করেছে বলা যায়। তবে গ্রন্থটিতে কোনো নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জী না থাকাটা বিস্ময়ের কারণ হয়েছে। গবেষণাগ্রন্থের ক্ষেত্রে এমন অসম্পূর্ণতা আশা করা যায় না। মুদ্রণ-প্রমাদও পীড়াদায়ক। বিশেষত বিদ্যাসাগরের সুখ্যাত পরিহাসের পরেও 'দুরাবস্থা' ছাপা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুলিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থের গৌরব বাড়িয়েছে।

প্রতিবেশী, সাহিত্য

ইসমত চুগতাই—ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম জ্যোতিষ্ক

কমলেশ সেন

নিজের সম্পর্কে ইসমত এভাবেই এক জবানবন্দিতে বলেছিলেন, 'আমার জীবনী এমন নয় যে তা আমি গর্বের সঙ্গে বলি। ছেলেবেলায় মারকুটে ছিলাম। পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা যেভাবে পড়াশোনা নিয়ে থাকত, আমি সেভাবে কোনোদিন পড়াশোনা করি নি। শিক্ষকরা আমার সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন না। আলিগড় আর লখনৌতে পড়াশোনা করি। পড়াশোনার কোনো ঢঙ ছিল না। যখন পড়তে ইচ্ছে করত না, তখন দৈনিক খবরের কাগজটুকুও পড়তাম না। আর যখন পড়তে মন চাইত, তখন দিনরাত যে কোথা দিয়ে কেটে যেত, বুঝতে পারতাম না। এ হাল ছিল লেখার ব্যাপারেও।

'সবচেয়ে প্রথম যে গল্প লিখি তার নাম "বচপন"। পাঠাই "তহজীব-এ-নসবাঁ"-তে। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ইমতাজ আলী সাহেব। তিনি উত্তরে লেখেন, এই গল্পে তুমি কোরানের তালিম নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছ। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, লেখা বন্ধ। তারপর কোনোভাবে "ফসাদী" গল্প লিখি। সে গল্প সাহস করে "সাকী"-তে পাঠাই। আর লিখে জানাই, গল্প ছাপা হলে যেন আমার নাম না দেওয়া হয়।

'বস্তুত আমার দুর্নামের ভয় ছিল, লোকে কী বলবে! জানি না এত লুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও, বদনামের ভয় কেন!

'১৯৩৮-এ কথা। এ সময় থেকে নিয়মিত লিখছি।

'জীবনী সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, কখন বিয়ে করি। এ কথা বলতে ভয় হয়, পাছে আমার ক্ষতি হয়, কারণ আমার এক সমালোচক বলেছেন, বিয়ের পর থেকেই আমি হেঁসেলে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে নিয়েছি যে, আমার লেখার মধ্যে নাকি আর প্রাণ নেই। যদি আপনারা এ সম্পর্কে কিছু জানেন, তাহলে হিসেব কষে বলবেন, আমার কোন্-কোন্ গল্প বরবাদ হয়েছে।'

তিরিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে যাঁরা উর্দু সাহিত্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন, তাঁরা হচ্ছেন কৃশন চন্দর, সদাত হসন মন্টো, রাজেন্দ্র সিংহ বেদী, আহম্মদ নদমী। এঁদের মতো শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইসমত চুগতাই লিখতে শুরু করেন। তাঁর গল্পের দেহের মধ্যে এমন এক পুরুষালি ঢঙ ছিল, যা তাঁকে শুধু বৈশিষ্ট্যমণ্ডিতই করে নি, তাঁকে এইসব দুর্ধর্ষ কথাশিল্পীদের সারিতে দাঁড় করিয়েছে। তিনি টক্কর দিয়ে চলেছেন। তাঁর গল্পের উপাদানে এমন বিষয়বস্তু উপস্থিত হয়েছে, এমন শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, এমন মনোবিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা কোনো মহিলার কলম থেকে উৎসারিত হওয়া সম্ভব নয়। মুসলিম সমাজের অন্তঃপুর—অন্তঃপুরের বোবা এবং বধির আর্তনাদ, ব্যভিচার, যন্ত্রণা তিনি এমনভাবে গভীর বোধ নিয়ে তুলে ধরেন, যা উর্দু সাহিত্যে সম্পূর্ণ নতুন। ঝুপড়ি-পট্টির খুব নীচুতলার মেয়েরা—যেখানে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সমস্ত সম্প্রদায়ের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে, দরিদ্রতা যাদের নিত্যসঙ্গী, শ্রম যাদের জীবনের অঙ্গ, বেশ্যা আর ভালো মেয়েরা সেখানে বাস করে, তাদের জীবনের নানা ঘটনা ছোটো-ছোটো মনোবিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তিনি এক গভীর বোধের জগতে নিয়ে যান। এসব গল্পের প্রতিটি শব্দের ব্যবহার, যা এই সমাজে বহুল প্রচলিত, তা তিনি অনায়াসে ব্যবহার করেন। এই ব্যবহার শুধু

চমৎকারিত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এবং তা ব্যবহার বা প্রয়োগের মধ্যে—এমন এক জীবন—জীবনবোধকে তিনি অনায়াসভাবে তুলে ধরেন, যা উর্দু সমালোচকদের কাছে এক অভিজ্ঞতাস্বরূপ।

বোধহয় যথার্থভাবেই উর্দুর অন্যতম কথা-সাহিত্যিক কৃশন চন্দর তাঁর "চৌটে" গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলেন :

'ইসমতের নাম উঠতেই পুরুষ গল্পকাররা পালায়। লজ্জিত হয়,—ঘাবড়ে যায় ··

'গল্পের দিশামুখকে লুকিয়ে রাখতে, পাঠককে হতচকিত করে দিতে এবং শেষে পাঠকের হতচকিত-ভাব এবং তার অধীর আগ্রহকে খুশিতে ভরিয়ে তোলার যে বিশেষতা, এ বিষয়ে ইসমত আর মন্টো একজন আর-একজনের খুব কাছের। আর এই শিল্প-কুশলতায় উর্দুর খুব কম লোকই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন।'

কৃশন চন্দর বলেছেন ইসমতের নাম উঠতেই পুরুষ-গল্পকাররা পালায়, লজ্জিত হয়—ঘাবড়ে যায়। এর কারণ কী?

কারণ যে ভাষায় তিনি জীবনের নির্মমতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেই ভাষা প্রয়োগের জন্যে তিনি নিজের মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নেন নি। বরং সেইসব মানুষের অনায়াস অভ্যস্ত জীবনযাত্রা যে কথা-সাগরের মধ্যে প্রবাহিত জীবন্ত, তা-ই তিনি বিনা দ্বিধায় জীবনের গভীর থেকে তুলে এনেছেন। আর যে গভীরতাকে,—যাঁরা এ জীবনকে দেখেন নি, জানেন না, তাঁদের কাছে সেই আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর শব্দপ্রয়োগে পুরুষ-লেখকরাও ঘাবড়ে যান—তাঁদের শালীনতায় ভদ্রতায় বাধে।

"অদব-এ-লতীফ"-এ চল্লিশ দশকের গোড়ায় যখন ইসমতের গল্প "লিহাফ" (অর্থাৎ লেপ) প্রকাশিত হয়, তখন এই গল্প নিয়ে খুব হইচই হয়। অশ্লীলতার দায়ে এই গল্প আদালতে ওঠে। মুসলিম সমাজের এক খানদানি পরিবারের অন্তঃপুরের সমকামী বেগম-সাহেবাকে নিয়ে এই গল্প। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার মধ্যে ইসমত বেগম-সাহেবার মনোজগতের ঈপ্সাকে চিত্রিত করেছেন। এই বিতর্কিত গল্প নিয়ে মনটো বলেছেন, তিনি যখন বোম্বের ক্লেমর রোডে এডলফী চেম্বরের ষোলো নম্বর ফ্ল্যাটে থাকতেন একদিন শাহিদ লতিফ তাঁর স্ত্রী ইসমতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ফ্ল্যাটে আসেন। সময়টা ছিল ১৯৪২ সাল। বোম্বে তখন খুব উত্তেজনাময় শহর। সমস্ত পরিবেশ রাজনীতিতে ভরপুর। যেজন্যে বেশ খানিকক্ষণ স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে তাঁরা কথাবার্তা বললেন। তারপর তাঁদের আলোচনার দিশা পালটাল। মনটো গল্পের আলোচনায় এলেন।

এর ঠিক একমাস আগে যখন মনটো অল ইনডিয়া রেডিও, দিল্লিতে চাকরি করতেন, সেই সময় "অদব-এ-লতিফ"-এ ইসমতের "লিহাফ" প্রকাশিত হয়। এই গল্প পড়ে, তিনি কৃশন চন্দর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।

মনটো পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা এবং ইসমত সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, বলতে গিয়ে বলেছেন :

যখন "অদব-এ-লতিফ"-এ 'লিহাফ' প্রকাশিত হয়, আমার মনে আছে তখন আমি কৃশন চন্দরকে বলেছিলাম, গল্প খুব সুন্দর, কিন্তু শেষ বাক্যটি মোটেই শিল্পসম্মত নয়। আহম্মক নদীম না হয়ে যদি আমি সম্পাদক হতাম, তবে আমি শেষ বাক্যটি অবশ্যই কেটে দিতাম।

আমি ইসমতকে বলেছিলাম, আপনার "লিহাফ" গল্প আমার খুব ভালো লেগেছে। কথা বলার বা বর্ণনা দেওয়ার আপনার এমন একটা ঢঙ আছে, যা আপনি বেশ রপ্ত করেছেন। কিন্তু খুব অবাক হয়েছি, গল্পের শেষে আপনি অযথা এই বাক্য কেন জুড়ে দিয়েছেন?

ইসমত জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, এই বাক্য কী দোষ করেছে?'

উত্তরে আমি ইসমতকে কিছু বলতে চাইছিলাম, দেখলাম, ওঁর চোখ-মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। কোনো বেমালল অপ্রত্যাশিত জিনিসের নাম শুনলে, সাধারণ ঘরোয়া মেয়েদের চোখে-মুখে যে লজ্জার ভাব ছলকে উঠে, ইসমতের মধ্যেও সেই ভাব ছলকে উঠল। আমি খুব নিরাশ হলাম। আমি "লিহাফ"-এর এক-একটা অংশ নিয়ে ইসমতের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইছিলাম।

যখন ইসমত চলে গেলেন, আমি মনে-মনে বললাম, 'দেখছি, একেবারে মেয়েমানুষ।'

অনেক—অনেক দিন পরে আমি যখন প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবলাম, তখন গভীরভাবে অনুভব করলাম, নিজের শিল্পকলাকে সুরক্ষিত করার জন্যে মানুষকে নিজের সীমানার ঘেরের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন। ড. রশীদ জাঁহার (উর্দুর অন্যতম কথাশিল্পী) শিল্প-কলা আজ কোথায় নিমজ্জিত? চুল ছেঁটে, সেই চুলের কিছুটা মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে, আর বাকিটা তিনি তাঁর প্যানটের পকেটে গুঁজে রেখেছেন। ফরাসি সাহিত্যের জর্জ সাঁ নারীর খুশবু আর ভাগ্যের জামা খুলে পুরুষের তৈরি সমাজে জীবনযাপন করছেন। পোল্যানডের সঙ্গীতকার জোপেস মুখ দিয়ে রক্ত তুলে প্রচুর হিরে-জহরত সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু নিজের গুণের শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর পাকস্থলির মধ্যে খুলে দিয়েছেন।

আমরা জানি, মেয়েরা রণক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে, পাহাড় ভাঙে, আর গল্প লিখতে-লিখতে ইসমত চুগতাই হয়ে যায়। কিন্তু কখনও-কখনও তাদের হাতের মেহদির রঙ, চুড়ির ঠুনঠুন শব্দ ভালো লাগে। প্রয়োজনও আছে।

পুরুষ-শাসিত সমাজে লড়াই করতে-করতে ইসমত এগিয়ে গিয়েছেন। মনটো-কৃষণচন্দর-বেদীর সঙ্গে টক্কর দিয়েছেন। টক্কর দিতে গিয়ে তিনি তাঁর গল্পের একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল, নিজস্ব বর্ণনারীতি এবং কথা বলার ঢঙ তৈরি করেছেন। তাঁর "বিচ্ছু ফুফী", "পেশা", "নিয়ালা", "মোখা", "সাম" ইত্যাদি গল্প শুধু কথন-বর্ণনার জন্যেই আমাদের অন্তর্জগৎকে নাড়া দেয় না, আমাদের মানবিক মূল্যবোধকে জাগরিত করে। আমাদের ভাবায়। এমন নীচুতলার নানা পেশায় রত মেয়েদের সঙ্গে আমাদের আত্মিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। "নিয়ালা" গল্পের কুমারী নার্স সরলাবেনের জন্যে ঝুপড়ি-পট্টির সমস্ত মেয়েদের ভালোবাসা ঝরে পড়ে। সরলাবেনের (সরলাবোনের) বিয়ে হোক, তাঁর জীবনের প্রেম সার্থক হোক—তারা সবাই চায়। তারা সবাই মিলে তাকে সাজিয়ে দেয়। নিজেদের কাপড়-জামা, পাউডার হাই-হিল জুতো দিয়ে সরলা-বেনের জীবন মর্মরিত হয়ে ওঠে। "মোখা" (ফোকর) গল্পে দেয়ালের ফোকরে কাগজ গুঁজে, এক দিকে ভদ্রঘরের মেয়ের জীবন, অন্য দিকে এক বেশ্যার জীবন। সীমারেখা দেয়াল নয়। কাগজ গুঁজে রাখা একটা ফোকর। মাঝে-মাঝে কাগজ সরিয়ে জীবন দেখা। অনুভব করা হয়। সব একাকার হয়ে যায়। কে ভালো আর কে খারাপ মেয়ে বোঝা দায়। একটা তীব্র ব্যথা বুকের মধ্যে বাসা বাধে। "পেশা" গল্পে এভাবে আসে নিছক বেশ্যা-জীবন নয়। অন্য এক অনুভব।

মুসলিম সমাজ, এই সমাজের মেয়েদের দুঃখ এবং যন্ত্রণাও তাঁর গল্পে এসেছে। মুসলিম সমাজের পুরুষ-তান্ত্রিক আধিপত্যের নীচে মেয়েরা তাদের কামনা-বাসনাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তা পিষ্ট হচ্ছে। চোখের জলে, যন্ত্রণার গোঙানিতে থমথম করছে নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উপর-তলার ছোটো বড়ো মাঝারি অন্তঃপুর। যেখানে পুরুষরা অলীক। অথচ পুরুষদের কামনা-বাসনার কাছে শেষ হয়ে যাচ্ছে ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়ে।

ইসমত নানাভাবে এই সমাজ দেখেছেন। দেখেছেন, নারীর অপরিচিত কামনা-বাসনা।

তাঁর "মাসুমা" উপন্যাসে এমন একজন মেয়েকে তিনি তুলে ধরেন যে মেয়ের জন্মের পর কোরান

শরীফ দেখে নামকরণ করা হয় 'মাসুমা'। কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, মাসুমা বোম্বাইয়ের এহসান সাহেবের কৃপায় আহমদ সাহেবের উপপত্নী হয়। 'মাসুমা'-র নতুন নাম রাখা হল শবনম। কিন্তু ভাগ্যে তো সুখ লেখা ছিল না, আহমদ সাহেবের ব্যাবসা দেউলিয়া হয়ে গেলে শবনমের জীবনের নৌকোর হাল ধরল আর-এক নতুন শেঠ—সুরজমল। সুরজমলের অনেক উপপত্নী ছিল। উপপত্নীর নামে তার এক-একটা ব্যাবসা ছিল আর তার উপপত্নীর সংখ্যাও বৃদ্ধি হচ্ছিল—কোম্পানির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর এ-ব্যাবসার বিনিময়ে সে নানা ফুর্তির উপকরণ তাদের সরবরাহ করত। কিন্তু সুরজমলের দৌলতও তার ভাগ্যে সইল না। একটা চেক সই করা নিয়ে শবনমের সঙ্গে সুরজমলের খটাখটি হল। শবনম আবার বিক্রি হয়ে গেল। এল নবাব সাহেবের হাতে। তারপর শুরু হোটেলের জীবন।

'মাসুমা' উপন্যাসে ইসমত উপরতলার পয়সা-ওয়ালা সমাজকে দেখিয়েছেন। ধনদৌলতের আড়ালে তাদের কদর্যরূপ। এই উপন্যাসের কথাবস্তুকে তিনি এমনভাবে ধরে রেখেছেন, এমনভাবে শব্দের প্রয়োগ করেছেন, যা এ সমাজের একান্ত। কলুষ মানসিকতায় যার জন্ম হয়।

এ-সমস্ত কাল জুড়ে তার অসংখ্য গল্প বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সংগ্রহ আকারেও বের হয়। তাঁর গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'কলিয়া', 'চৌঁটে', 'এক বাত', 'দুই-মুই', দো-হায়', 'দো-জখ', 'শৌতান', 'কুআঁরী'। উপন্যাসগুলির মধ্যে হচ্ছে 'জিন্দী টেঢ়ি লকীর', 'মাসুমা', 'সৌদাই', 'জংলী কবুতর', 'দিল কী দুনিয়া', 'অজীব-অদমী'। আর তাঁর আত্মকথা 'পেয়রাহন'।—আমাদের অবশ্যই ভাবিয়ে তোলে।

ফিল্মি-দুনিয়া নিয়ে লেখা তাঁর উপন্যাস "অজীব আদমী" পাঠকসমাজে খুব সমাদৃত হয়। মানুষ অভিনয় করতে-করতে ভুলে যায় সে অভিনয় করছে। অভিনয়ের এক বিশেষ মুহূর্তে যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, আর যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় অভিনয়ের সেই মুহূর্তকে ধরে রাখার জন্যে, কিন্তু সে ভুলে যায় তা অভিনয়েরই সম্পর্ক। আর এই অভিনয়ের মধ্যে এক নতুন প্রণয়-কথা অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। এমন একটা ভালোবাসা যখন অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে—ডালপালা মেলে, তখন ধর্ম শুধু এক অদ্ভুত—অচেনা মানুষে রূপান্তরিত হয় না, জরীনাও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

ফিল্মি দুনিয়ার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল বলেই, এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের মানুষকে তিনি দেখেছেন। তাদের চিনেছেন—বুঝেছেন। এই দুনিয়ার মধ্যে যেমন নির্মম বাস্তবতা আছে, তেমনি আছে এক স্বপ্নময় পৃথিবী যার অস্তিত্ব বাস্তব দুনিয়াতে নেই। রহস্য অবশ্যই আছে। সেই রহস্যের সন্ধান ইসমত করেছেন। মনের শত-সহস্র তারের একটিতে মাত্র তিনি ঝংকার তুলেছেন।

যে কথন, যে বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের কথা আমি বলেছি, তার সামান্য একটু উদাহরণ আমি দিচ্ছি। "উফ্ রে বচ্ছে"-তে তিনি লিখছেন :

'ঘর কেন, মহল্লার পর মহল্লা। রোগ ছড়িয়ে পড়ে, মহামারী দেখা দেয়। দুনিয়ার বাচ্চারা পটাপট মরতে লাগল, কী মজার ব্যাপার, এখানে তার কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। প্রতি বছর আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিটি ঘর হাসপাতাল হয়ে যায়। শুনেছি, দুনিয়ায় বাচ্চারাও মরে। মরে হয়তো। কিন্তু কে তার খবর রাখে?'

এমন অনায়াসভাবে ইসমত ঝুপড়ি-পট্টির জীবন—রোগ শোকের বর্ণনা দেন। আর এই বর্ণনার মধ্যে এমন এক জ্বালা—এমন এক ক্ষোভ আছে, যা আমাদের অন্তরের গভীর পর্যন্ত স্পর্শ করে।

এসব ঝুপড়ি-পট্টির অঞ্চলে জীবনের মহাসমারোহ যে অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে, তা তিনি কিভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন, তা তাঁর গল্প পড়লেই বোঝা যায়। এই প্রত্যক্ষ তিনি দূরে রাজপথে দাঁড়িয়ে করেন নি। কিন্তু একজন মেয়ে হয়ে তিনি কিভাবে তা প্রত্যক্ষ

করেছিলেন, এবং নিজের মধ্যে তাদের ভালো-মন্দ সঞ্চারিত করেছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। এই বিস্ময় অনেকের মধ্যেই জন্মেছিল। তাই অনেকে কটূক্তি করতেও ছাড়েন নি। অনেকে অবশ্যই আবার বলেছেন, তাঁর গল্প পড়লে বোঝা যায়, এ জগৎকে—এ জগতের মানুষদের তিনি বেশ ভালোভাবেই চেনেন। এই অঞ্চলের মানুষ এবং তাদের জীবনকে গড়ে তুলতে, ঘটনাকে বিন্যস্ত এবং জীবন্ত করে তুলতে তিনি হামেশাই এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা শব্দকোষে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পাওয়া যাবে না। এ মানুষের নিজের তৈরি ব্যবহারিক জীবনের ভাষা। সে শব্দ জীবন্ত—প্রতিনিয়ত পালটাচ্ছে। এই ভাষা এবং শব্দের মধ্যে অন্য এক জীবন কথা বলে। যে জীবনের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আবরণহীন এক জীবন। এরা সবাই একসূত্রে গাঁথা—অসংখ্য রঙ-বেরঙ ফুলের সমাহার। নানা ভাষার এবং নানা ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি বাস করছে হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান। খাচ্ছে, গল্প করছে, হাসছে, মার-পিট খুনোখুনি করছে। বাঁচার জন্যে কত রকম ধান্ধা করছে। এখানকার মেয়েরা বেঁচে থাকার জন্যে দেহ বিক্রি করে। দেহ বিক্রি করে স্বামী-সন্তান প্রতিপালন করে। দেশে টাকা পাঠায় একটুকরো জমিকে মহাজনের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনার জন্যে। ফেলে-আসা গ্রামের স্বপ্ন দেখে। সংসারের জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। পুরুষরা মজুরি খাটে, মদের ধান্ধা করে, বেশ্যার দালালি করে পয়সা কামায়, চুরি-চামারি করে কোনোরকমে বেঁচে থাকে।

এরাই হচ্ছে ইসমত চুগতাই-এর লেখার সামগ্রী। তিনি দরদ দিয়ে তাদের দেখেছেন—উপলব্ধি করেছেন। এক প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে তিনি নীচু-তলার এই মানুষদের তুলে ধরেছেন তাঁর মতো করে।

কিন্তু গল্পের শেষে এমন এক জায়গায় এনে তিনি পাঠককে ছেড়ে দেন, যা পাঠকের কল্পনার অতীত। ফলে পাঠকের মানসিক জগতে এক বিস্ফোরণ ঘটায়। পাঠক ভাবতে চেয়েছিলেন নিজের মতো করে। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না।

গল্পের শেষ অনেক সময় খুব সাধারণ মনে হলেও, পাঠককে আবার পড়তে হয়। মিলিয়ে দেখতে হয়, তিনি যা ভেবেছেন, তাই কিনা।

ইসমত চুগতাই হিন্দু মুসলমান খ্রীশ্চান—কোনো ধর্মের মানুষকে নিয়ে বিশেষ কোনো গল্পে লেখেন নি। কোনো ধর্মকে আঘাত করে থাকলে, নিছক আঘাতের জন্যে করেন নি। মানুষকে নিয়ে তিনি গল্প লিখেছেন, তাই মানুষের কথা বলতে গিয়ে, যারা মানুষকে নিয়ে বেসাতি করে তাদের দিকে শুধু অঙ্গের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়েছেন। তাই তিনি যখন বলেন, কোরান শরীফ দেখে যখন মানুষের নাম রাখা হয়, তখন তিনি কোনো ধর্মগ্রন্থকে অবজ্ঞা বা ব্যঙ্গ করেন না। ব্যঙ্গ করেন সমাজের যারা কর্ণধার তাদেরকে। যারা ধর্মকে নিয়ে ব্যাবসা করে। দৌলত কামানোর জন্যে ধর্মকে খুন করে। আর সে রক্ত সারা দেশে ছিটিয়ে যায়।

ইসমত চুগতাই মানুষের ব্যথার—খুন হয়ে যাওয়া ধর্মের রক্ত দিয়ে জীবনের কথা—মানুষের কথা লিখেছেন।

ইসমত চুগতাই তাই লিখতে-লিখতে সমাজে প্রভুত্বের আসনে যারা বসে আছে তাদের আসন টলিয়ে দিয়েছেন।

মুষ্টি-মালিশ

ইসমত চুগতাই

পোলিং বুথে খুব ভিড় ছিল। যেন কোনো ফিল্মের প্রিমিয়ার শো হচ্ছে। পাঁচ বছর আগেও আমরা এমনি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কিউ লাগিয়েছিলাম। যেন ভোট দিতে এই কিউ লাগাইনি, সস্তা দরে গম-চাল আনতে গিয়েছিলাম। চোখে-মুখে একটা আশা—একটা আকাঙ্ক্ষার আলো ঝিলিক দিচ্ছিল। কিউ লম্বা হলে কী হবে, এক সময় তো আমারও সময় আসবে। একটা না একটা কিছু হবেই। ভরসা করার মতো নিজের মানুষ আছে। ভাগ্যের দড়ি তো আমার নিজের হাতেই ধরা। সমস্ত গরিবি দূর হয়ে যাবে।

'বাঈ,···এই বাঈ, ভালো আছ তো?' একটা তেলচিটচিটে ময়লা ওড়না মাথায় কষে বাঁধা, হলদেটে দাঁত বের করে একজন মহিলা আমার হাত আবেগে জড়িয়ে ধরল।··

'আরে গঙ্গাবাঈ···'

'রতিবাঈ,···গঙ্গাবাঈ বলে যাকে ভাবছ, সে আর-একজন···বেচারি মারা গিয়েছে।'

'ঈশ, বেচারি!' সঙ্গে-সঙ্গে আমি এক ডিগবাজি খেয়ে পাঁচ বছর পেছনে চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'মালিশের মুষ্টি'?

'মালিশ।' রতিবাঈ চোখ মারল। 'শালিকে অনেক বলেছি, কিন্তু শুনল না। তুমি কাকে ভোট দেবে, বাঈ?'

'তুমি কাকে দেবে?'

'ভোট দেব আমার জাতের লোককে। আমার গ্রামের লোক কিনা।'

'পাঁচ বছর আগেও তুমি তোমার জাতের লোককে ভোট দিয়েছিলে।'

'হাঁ বাঈ, শালা একেবারে বরবাদ হয়ে গেল। কিচ্ছু করল না।'

'এও তোমাদের জাতের লোক?'

'হাঁ, একেবারে ফাস্ক্লাস। দেখো বাঈ, এবার কীরকম খেল জমে।'

'তারপর তুমি গাঁয়ে ফিরে ধানভানার কাজ করবে?'

'হাঁ বাঈ।' রতিবাঈ তার কুতকুতে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল। রতিবাঈয়ের পরনের শাড়ি আরও শতছিন্ন হয়েছে। চুল সাদা হয়ে গিয়েছে। চোখের উজ্জ্বলতা কমে গিয়েছে।··· চৌপাটিতে দাঁড়িয়ে বড়ো-বড়ো লিডাররা যে ওয়াদা করে, নেই ওয়াদাকে ভরসা করে সে আজ ভোট দিতে এসেছে।

'বাঈ, তুমি এই ছিনালের সঙ্গে কেন এত গপ্প কর?' রতিবাঈ বেডপ্যান সরাতে-সরাতে আমাকে উপদেশ দিতে লাগল।

আমি না বোঝার ভান করে বললাম, 'কেন, কী হয়েছে?'

'আমি তোমাকে বলছি, ওই ছুকরি একেবারে নচ্ছার। শালি একটা পাক্কা বদমাশ।' রতিবাঈয়ের ডিউটি শুরু হওয়ার আগে গঙ্গাবাঈ রতিবাঈ সম্পর্কে আমাকে বলে, 'শালি একেবারে লোফার।' হাসপাতালের এই দুজন আয়াই সবসময় লড়াই-ঝগড়া করত।

'ওই শালা শঙ্কর থোড়াই ওর ভাই হয়। ওর ইয়ার। একসঙ্গে শোয়।' গঙ্গাবাঈ বলেছিল।··· রতিবাঈয়ের মরদ শোলপুরের কাছে একটা গ্রামে থাকে। সামান্য একটু চাষের জমি আছে। আর এই জমিটুকু নিয়েই সে গাঁয়ে পড়ে আছে। সমস্ত ফসল

দেনার দায়ে চলে যায়। ঋণের আর সামান্য টাকা বাকি আছে। কয়েক বছরের মধ্যে তা শোধ হয়ে যাবে। আর সেখানে গিয়ে সে কী আনন্দেই না ধান ভানবে। ধান ভানার স্বপ্ন ওরা দুজনে এমনভাবে দেখে, যেন তারা প্যারিসের স্বপ্ন দেখছে।

'কিন্তু রতিবাঈ, তুমি পয়সা কামাই করার জন্যে বোম্বে কেন এসেছ? তোমার স্বামী এলে না হয় এক কথা ছিল।'

'আরে বাঈ, ও কিভাবে আসবে। খেতের কাজ তো আর আমার দ্বারা হবে না।'

'বাচ্চাদের দেখাশোনা তবে কে করে?'

বাঈ খিস্তি দিয়ে বলল, 'এক রাঢ় আছে।'

'তোমার স্বামী আর-একটা বিয়ে করেছে?'

'শালা আর-একটা বিয়ে করবে কেন, ওই রাঁঢ়কে পুষছে।'

'তুমি তো গাঁয়ে থাকছ না, ও যদি মালকিন হয়ে যায় তবে···?'

'কী করে হবে, মারতে-মারতে ভূষি করে দেব না। ধার শোধ হয়ে গেলে চলে যাব আমি।'

বুঝতে পারলাম, রতিবাঈ নিজের থেকেই এক বেওয়ারিশ মহিলা হয়েছে। স্বামী আর ছেলেপুলেদের গাঁয়ের বাড়িতে ছেড়ে এসেছে। যখন জমি ছাড়াতে পারবে, তখন সে গাঁয়ে ফিরে নিজের ঘরগৃহস্থালি সামলাবে—ধান ভানবে। স্বামী যাকে রেখেছে তার কী হবে? সে অন্য কোনো মরদ খুঁজে নেবে। যার বউ বোম্বে পয়সা কামাই করতে এসেছে,—তার ছোটো-ছোটো সন্তানদের দেখার কেউ নেই।

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই মহিলাটির স্বামী নেই?'

'থাকবে না কেন?'

'সে তার কাছে থাকে না?'

'তার খেত বিক্রি হয়ে গিয়েছে। ওর মরদ খেতে মজুর খাটে। কিন্তু বছরে আট মাস পেট চালানোর জন্যে চুরিচামারি করে, বা বড়ো শহরে চলে যায়। ভিক্ষে করে দিন চালায়।'

'আর বাচ্চারা?'

'চার-চারটি বাচ্চা আছে। আছে মানে ছিল। একটা বাচ্চা বোম্বেতে হারিয়ে গিয়েছে। আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। মেয়ে পালিয়ে গিয়েছে। ছোটো বাচ্চাটা সাথে থাকে।'

'রতিবাঈ, তুমি কত টাকা গাঁয়ে পাঠাও?'

'মাসে চল্লিশ টাকা।'

'তা হলে তোমার চলে কিভাবে?'

'আমার ভাই আমার খরচ সামলায়।' বুঝলাম, সেই ভাই, যার সম্পর্কে গঙ্গা বলেছিল,—ওর ফ্রেনড।

'তোমার ভাই তোমাকে মারে?'

'শালা, গঙ্গাবাঈ তোমাকে বলেছে বুঝি। না বাঈ, বেশি মারে না। যখন দারু খেয়ে আসে, তখন মারে···'

'কিন্তু রতিবাঈ, তুমি ওকে ভাই বল কেন?'

রতিবাঈ হাসতে লাগে, 'আমাদের মধ্যে তা-ই বলার রেওয়াজ আছে।'

'রতিবাঈ, চল্লিশটাকা তো মাইনে পাও, তাহলে ধান্ধা কর কেন?'

'এ-টাকায় কী করে চলে? পাঁচ টাকা ঘরের ভাড়া, আর লালাকে দিতে হয় তিন টাকা।'

'লালাকে কেন টাকা দাও?'

'সব ঘরের মেয়েরাই দেয়, না দিলে ঘর থেকে বের করে দেবে।'

'সেজন্যে ধান্ধা কর?'

রতিবাঈ লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'হাঁ বাঈ।'

'আর তোমার ভাই কী করে?'

'বাঈ, বলার মতো তেমন কিছু করে না।···মদের ধান্ধা করে। খু-ব খারাপ ধান্ধা। পুলিশকে পয়সা দিতে না পারলে ধান্ধা বন্ধ। তল্লিতল্পা গোটাতে হয়।'

'মানে বোম্বে ছেড়ে অন্য শহরে?'

'হাঁ, বাঈ।'

এর মধ্যে নার্স এল। রতিবাঈকে ধমক দিল।

'কেন বসে-বসে গ্যাঁজাচ্ছিস···দশ নম্বরে বেডে যা, বেডপ্যান সাফ করে দে।' রতিবাঈ দাঁত কেলিয়ে দৌড়ে পালাল।

'আপনি কেন এই লোফার মেয়েদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেন! আপনার বিশ্রাম করা দরকার। না হলে আবার ব্লিডিং শুরু হয়ে যাবে।'···নার্স বাচ্চাকে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

সন্ধ্যার সময় গঙ্গাবাঈয়ের ডিউটি ছিল। ঘন্টি না বাজাতেই ও নিজের থেকে এল। জিজ্ঞেস করল, 'বাঈ, বেডপ্যান চাইছেন?'

'না গঙ্গাবাঈ, বোসো।'

'রাঢ় সিস্টার বোস মারবে। তোমাকে কী বলছিল?'

'কে, সিস্টার? বলছিল, বিশ্রাম কর।'

'সিস্টার নয়, রতিবাঈ কী বলছিল?'

'বলছিল, পোপটলাল গঙ্গাবাঈকে খুব মারে?'

'ওই শালা আমাকে কী মারবে?'

'তুমি তোমার গাঁয়ে কবে ফিরবে?'

গঙ্গার উজ্জ্বল কালো চোখ বহু—বহু দূরের ঘন সবুজের মধ্যে হারিয়ে গেল। বুক ভরে শীতল হাওয়া টানল। গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'যখন ঘরের ফসল ঘরে উঠবে, তখন ফিরে যাব। গত বছর বন্যা হয়েছিল, সব ধান পচে যায়।'

আমি ওকে উশকে দেয়ার জন্যে বললাম, 'গঙ্গাবাঈ, তোমার স্বামী তোমার ইয়ারের কথা জানে?'

'বাঈ, তুমি কী যে বলছ!' গঙ্গাবাঈ মুখ ভার করল। মুহূর্তের জন্যে চুপ হয়ে গেল। একটু লজ্জাও পেল। সঙ্গে-সঙ্গে সে কথা ঘোরাল, 'বাঈ, দু-দুটি মেয়ে হয়েছে, শেঠজী গোসা করবে না?'

'কোন্ শেঠ?'

'তোমার মরদ, সে যদি আর-একটা বিয়ে করে?'

'ও আর-একটা বিয়ে করলে, আমিও আর-একটা বিয়ে করব।'

'তোমাদের মধ্যেও এসব চলে? বাঈ, আমি ভেবেছিলাম, তুমি কোনো উঁচু জাতের।' ওর কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল, গঙ্গাবাঈ উঁচু জাত নিয়ে ঠাট্টা করছে। দ্বিতীয় বার মেয়ে হওয়ার জন্যে আমার ওপর নিশ্চয়ই ঝনঝাট নেমে আসবে। আর শেঠ যদি আমাকে ধোলাই না করে, তবে শেঠ একজন থার্ড ক্লাস শেঠ।

হাসপাতালে পড়ে-থাকা বন্দী জীবনের মতো। বিকালের দিকে দেখা করতে লোকজন আসে, আর বাদবাকি সময় গঙ্গাবাঈ আর রতিবাঈয়ের সঙ্গে গল্প-গুজব করে কাটিয়ে দিই। হাসপাতালে যদি এরা দুজন না থাকত, তবে আমি দম-বন্ধ হয়ে মারা যেতাম। দুজনে খুব সামান্য ঘুষ নিয়ে, একজন আর-একজন সম্পর্কে কী না উলটো-সিধে গল্প করত। একদিন আমি রতিবাঈকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রতিবাঈ, তুমি তো মিলে কাজ করতে, ছেড়ে দিলে কেন?'

'কী আর বলব বাঈ, মিলের কাজে খুব ঝামেলা। একে তো কাজ খুব কঠিন, আর তাছাড়া দু মাস পরে ছাঁটাই করে দেয়।'

'কেন?'

'কারণ, ছ মাস লাগাতার কাজ করলে ফাক্টরি ল চালু হয়ে যায়।'

যদি একজন শ্রমিক পার্মানেনট হয়ে যায়, তবে ফ্যাক্টরি ল অনুযায়ী অসুস্থতার ছুটি, ডাক্তার দেখানোর ছুটি হক হয়ে যায়। তাই প্রতি দু মাসের পর অদল-বদল করা হয়। এক বছরে একজন শ্রমিক খুব বেশি হলে চার মাস রোজগার করে। আর বছরের বাকি দিনগুলি গ্রামে থাকে। আর যাদের গ্রামে ফেরার অবস্থা থাকে না, তারা অন্য মিলে চক্কর কাটে। যারা একটু চালু, তারা ঝুলিতে লেবু রেখে, হাতে ভুট্টা নিয়ে বাজারে এমনভাবে ঘোরাফেরা করে, যেন বাজার করতে এসেছে। পাশ দিয়ে লোক গেলে, গলা নামিয়ে বলে ভুট্টা নিবেন? চার-চার আনা। এভাবে বিক্রি হয়ে যায়। সে পয়সা দিয়ে তরিতরকারি আর কলেরার

দাওয়াই কেনে। যাদের ভাগ্য ভালো নয়, তারা ভিক্ষে করে—বা বান্ধা করে। সেজেগুজে, মুখে পান পুরে, সন্ধ্যার সময় রেলওয়ে স্টেশনের আশেপাশে ঘুরঘুর করে। খদ্দের আসে। ইশারা করে। দাম-দর ঠিক হয়। এসব খদ্দেররা সাধারণত উত্তরপ্রদেশের। দুধওয়ালা, বা বেঘর শ্রমিক। তাদের বউ-ঝিরা গাঁয়ে আছে। অবিবাহিত ছোকরারাও আসে। তারা নোংরা গলিতে বা ফুটপাতে দিন গুজরান করে।

ভোরে গঙ্গাবাঈ আর রতিবাঈয়ের মধ্যে বারান্দায় ফ্রি-স্টাইল কুস্তি হয়ে গিয়েছে। রতিবাঈ গঙ্গাবাঈয়ের খোঁপা ধরে টান দিতে লাগল, আর গঙ্গাবাঈ রতিবাঈয়ের মঙ্গলসূত্র ছিঁড়ে দিল। কালো পুঁতি দিয়ে সরু সুতোয় গাঁথা মঙ্গলসূত্র। রতিবাঈয়ের সুহাগের চিহ্ন। রতিবাঈ এমন ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদল, যেন ও বিধবা হয়ে গিয়েছে। ঝগড়ার মূল বিষয়বস্তু ছিল, তুলোর একটা টুকরো। যে তুলোর টুকরো দিয়ে রুগীদের ক্ষত মুছে ফেলে দেওয়া হয়। মিউনিসিপালিটির আইন অনুসারে এই তুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু জানা গেল, রতিবাঈ আর গঙ্গাবাঈ এই তুলো ধুয়ে চুপ করে পুটলি বেঁধে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু আজকের ঘটনা চরমে ওঠে। গঙ্গাবাঈ হেডের কাছে নালিশ করে। রতিবাঈ গালিগালাজ দেয়। ফলে ঘটনা হাতাহাতিতে পরিণত হয়। দুজনকেই হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ার কথা ওঠে। কিন্তু ওরা হেডের হাত-পা জড়িয়ে ধরে, তাই ব্যাপারটা সেখানেই চাপা দিয়ে দেয়া হয়।

রতিবাঈয়ের বয়স গঙ্গাবাঈয়ের চেয়ে বেশি। তা ছাড়া রুগ্নও। গঙ্গাবাঈ ওকে জোর ধোলাই করে।

জুতোপেটাও করেছে। তাই রতিবাঈয়ের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। গঙ্গাবাঈ বয়সে ছোটো। যুবতীই বলা যায়। রতিবাঈ তাকে তার চেয়ে অনেক বেশি পাপিষ্ঠা মনে করত। কয়েকদিন আগেও রতিবাঈয়ের একজন ভালো খদ্দেরকে হাতিয়ে নিয়েছে। গঙ্গাবাঈ হামেশাই পেট নষ্ট করত। ···নর্দমায় আধমরা বাচ্চা রেখে এসেছিল। বাচ্চার গলা টিপে ফেলার চেষ্টা সত্ত্বেও, তখনও বাচ্চার দেহে প্রাণ ধুকধুক করছিল। ভোরে নর্দমার কাছে ভিড় জমে গিয়েছিল। রতিবাঈ ইচ্ছে করলে গঙ্গাবাঈকে ধরিয়ে দিতে পারত। কিন্তু এ রহস্যকে সে বুকের মধ্যে গোপন করে রেখেছিল। আর গঙ্গাবাঈকে দেখো, সে দিব্যি ফুটপাতে কাঁচা কুল আর একগাদা পেয়ারা নিয়ে বিক্রি করতে বসেছে।

'রতিবাঈ, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটেও যেতে পারে, তা সত্ত্বেও তোমরা কেন হাসপাতালে আস না?'

'হাসপাতালে কেন যাব? আমাদের মধ্যে এ কাজ জানা বাঈরা আছে। ডাক্তারের মতো ফাস ক্লাস।'

'ওষুধ-টষুধ দেয়?'

'কেন দেবে না? ফাস ক্লাস ওষুধ দেয়। মুষ্টি মারে,—খুব ভালো মালিশ।'

'এই 'মুষ্টি' আর 'মালিশ' কী জিনিস?'

'বাঈ তুমি বুঝবে না।' রতিবাঈ হাসতে লাগল।

অনেক বলার পর রতিবাঈ মুঠঠি আর মালিশ সম্পর্কে বলল। শুরুর সময় তো মালিশ কাজ দেয়। ডাক্তারের মতো। বাঈ রুগীকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে, ছাত থেকে টাঙানো দড়ি বা কোনো লাঠির সাহায্যে ওর পেটের ওপর দাঁড়িয়ে খুব লাফায়। লাফাতে-লাফাতে অপারেশন হয়ে যায়। । বা ওকে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে, বাঈ প্রথমে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়িয়ে টেনে খোঁপা বেঁধে নেয়। তারপর হাতের চেটোয় সরষের তেল নিয়ে মাথায় মেখে রোগীর পেটে মাথা ঠেকিয়ে ব্যাঙের মতো থপথপ করে। যাদের জান খুব শক্ত—মেহনত করে, সেইসব জোয়ান মেয়েদের এতেও কিছু হয় না। তখন মুঠঠি চালানো হয়। অপরিচ্ছন্ন নখওয়ালা হাত তেলের মধ্যে ডুবিয়ে, পেটের মধ্যে যে জীবন শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে, মেরে-মেরে তা পেট থেকে খসানো হয়। এ-রকম অপারেশন প্রথমবার ঠিকঠাক হয়। কখনো পেটের বাচ্চার গলা ভেঙে যায় আর কখনও বা পেটের মধ্যে সেই দেহ ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে বেরিয়ে আসে। কিছুটা ভেতরেই থেকে যায়।

মালিশে খুব একটা মৃত্যু হয় না। হাঁ, তবে হামেশাই মেয়েরা নানা রোগে আক্রান্ত হয়। দেহের বিভিন্ন জায়গায় দগদগে ঘা হয়। চিরদিনের জন্যে ঘা হয়ে থাকে, যেন সে ঘায়ের সঙ্গে তার একটা গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। সর্বক্ষণ জ্বর থাকে। আর ঈশ্বরের দেয়া মৃত্যু ধীরে-ধীরে তাকে গ্রাস করে। মুঠঠি খুব জোরে হঠাৎ দুর্বল মুহূর্তে পড়ে। আর তা পড়ে জানের বাজি রেখে। বাঈরা হামেশাই জানের বাজি ধরে এ খেলা খেলে। যে বেঁচে যায়, সে আর হাঁটাচলা করতে পারে না। কয়েক বছর ঘসটাতে-ঘসটাতে শেষ হয়ে যায়।

তারপর রতিবাঈ বলল, 'এ-সব বদমাশ মেয়েদের জন্যে এ-সাজাই ঠিক। মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে যাবে কোথায়।'

শুনতে-শুনতে আমার গা গুলিয়ে উঠল। আমি খুব বমি করলাম। রতিবাঈ রসিয়ে রসিয়ে মুষ্টি আর মালিশের কথা শোনাচ্ছিল। বমি দেখে ঘাবড়ে পালিয়ে গেল। হাসপাতালের নিস্তব্ধতা আমার মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। হায় খোদা, মানুষকে জন্ম দেয়ার জন্যে এ তো বড় সাজা। ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে-যেতেও আমি এ কথা ভাবছিলাম।

ভয়ে আমার গলার মধ্যে কাঁটা বিঁধছিল। রতিবাঈয়ের ছবিতে আমি নিঃসঙ্গতার রঙ ঢেলে দিলাম। তারপর তাতে প্রাণ সঞ্চার করলাম। দরজার পরদার ছায়া দেয়ালের ওপর দুলছিল। দেখতে-দেখতে গঙ্গাবাঈয়ের 'মালিশ' রক্তের রূপ গ্রহণ করল। একবার আমি ছোট্ট-ছোট্ট আঙুল, তুলতুলে গলা···। আমি চিৎকার করে উঠতে চাইলাম—কিন্তু কোনো আওয়াজই গলা দিয়ে বের হল না। আমি ঘন্টি বাজানোর জন্যে হাত বাড়ালাম। কিন্তু সাহস হল না। নীরব চিৎকার আমার বুকের মধ্যে পাক খেতে লাগল।

হাসপাতালের নিস্তব্ধ ধূসরতার মধ্যে যেন কোনো শিশুর চিৎকার গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। আমার ঘরের মধ্যেই এই চিৎকার উঠেছিল। কিন্তু সে চিৎকার আমি শুনতে পাই নি। আর সে চিৎকারও আমি শুনি নি, যে চিৎকার আমার কণ্ঠ থেকেই বের হয়েছিল।

'কোনো দুঃস্বপ্ন দেখেছেন নিশ্চয়ই?' বলে নার্স আমাকে মর্ফিয়ার ইনজেকশন দিল। আমি অনেক—অনেক কিছু বলতে চাইলাম। ওই দেখো সামনে গঙ্গাবাঈয়ের মালিশ। সেই মালিশ থেকে রক্ত ঝরছে, আর যে রক্ত গঙ্গাবাঈকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। গঙ্গাবাঈ-এর লাশ দেয়ালের ওপর ছটফট করছে। ওর চিৎকার আমার মগজের মধ্যে ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে চলছে···দূরে, কোথাও কোনো নর্দমায় কোনো শিশু মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না যেন হাতুড়ির আঘাতের মতো আমার হৃদয়ের ওপরে পড়ছে। আমার দেহের ওপর মর্ফিয়ার পর্দা ফেলে দিও না।···রতিবাঈকে পোলিং বুথে যেতে হবে। নতুন মিনিস্টার ওর জাতের লোক···ওর ঋণ শোধ হয়ে যাবে।···আর গঙ্গাবাঈ খুশিতে ডগমগ হয়ে ধান ভানবে। এ ঘুমের চাদর আমার মগজ থেকে সরিয়ে নাও। আমাকে জাগতে দাও। গঙ্গাবাঈয়ের টাটকা রক্তের ছোপ-ছোপ দাগ দেয়ালের ওপর ছড়িয়ে যাচ্ছে।···আমাকে জাগতে দাও।

ক্লার্কের মতো একজন বসে। সামনে টেবিল। আমার বাঁ হাতের আঙুলে যখন সে নীল কালি লাগিয়ে দিল, তখন আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি জেগে উঠলাম।

রতিবাঈ আমাকে উপদেশ দিল, 'আমার জাত-ভায়ের ডিব্বায় ভোট দিও।'

রতিবাইয়ের জাতভাইয়ের ডিব্বা বেশ জোরালো একটা মুষ্টি হয়ে আমার মগজে আঘাত করল। আমি রতিবাঈয়ের জাতভাইয়ের ডিব্বায় আমার কাগজ ফেললাম না।

অনুবাদ : কমলেশ সেন

১

"বিস্মৃতপ্রায় অনিন্দ্য-মানবমূর্তি—বাঙালি যার নাম"

"চতুরঙ্গ" নভেম্বর, ১৯৯১ সংখ্যাটি হাতে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে যারপরনাই বিস্মিতও হলাম। আনন্দিত হবার কারণ, আশরাফ শামীম লিখিত "বাঙালির পলিটিক্‌স্" প্রবন্ধটি এবং বিস্মিত হবার কারণ, ভবতোষ দত্তের "ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়" প্রবন্ধটি।

আশরাফ শামীমকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার নেই। তিনি যদি আমার প্রতিবেশী হতেন, তাহলে আমি স্বয়ং তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে, আমার মনোভাব তাঁকে জানাতাম। তাঁর প্রবন্ধের প্রতিটি বাক্যের পেছনে যে প্রেরণা কাজ করে চলেছে, তা হচ্ছে খাঁটি বঙ্গপ্রেম। তাঁর এই অসাধারণ প্রবন্ধটি পড়তে-পড়তে মনে পড়ে যায় বিগত যুগের দুই মহাপ্রাণ বাঙালির কথা, দীনেশচন্দ্র সেন এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌কে, যাঁরা ছিলেন অহিন্দু-অমুসলমান; ছিলেন শামীমের ভাষাতেই, 'বিস্মৃত-প্রায় অনিন্দ্য মানবমূর্তি—বাঙালি যার নাম।'

বাঙালির যথার্থ ইতিহাস যদি পেতে হয়, তাহলে কতগুলি পদ্ধতি-প্রকরণের ভেতর দিয়ে আমাদের যেতেই হবে, শামীমের প্রবন্ধে তার বহু ইঙ্গিত দেওয়া রয়েছে। যথা :

(১) "কুক্কুরজাতীয়" বুদ্ধিজীবীদের চিহ্নিত করা। চেনবার অন্যতম উপায় হচ্ছে, কোথাও কিছু চালাকি করতে গেলেই চেপে ধরতে হবে। বাইরে সেই ধূর্ত যত বড়ো কেষ্টবিষ্টুই হোক না কেন, যদি সত্যি-সত্যিই "কুক্কুরজাতীয়" হয়ে থাকে, কোনোরকম বিতর্কে না গিয়ে সে অবশ্যই পালাবে! (২) ব্রাহ্মণ্য-বাদী মগজ-ধোলাইয়ের জন্য, অন্তত পশ্চিমবঙ্গে যে দুই মহাপ্রাণ, হয় বিস্মৃত আর না হয় বিচ্ছিন্ন, সেই দীনেশচন্দ্র ও শহীদুল্লার রচনাবলী সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থাকা এবং তাঁদের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে পরবর্তীদের দৃষ্টিকোণের একটি তুলনাত্মক ধারণা থাকা। (৩) কোনো "ism" দ্বারা অভিষিক্ত নয়, হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, যথার্থ বঙ্গপ্রেমিক শক্তিগুলির একতাবদ্ধতা। শামীম কী সুন্দরই না লিখেছেন, 'আজ দরকার সমাজদেহে বিচ্ছিন্ন অবস্থানে অবস্থিত দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক-সমাজশক্তির ঐক্য-বদ্ধ হওয়া।' (৪) দ্বিজাতিতত্ত্ববিরোধী উপাদানে পূর্ণ বাঙলা সাহিত্য-নিদর্শনগুলোকে তুলে ধরা। (৫) এক ধরনের "কুক্কুরজাতীয়"-দের কথা লিখেছেন শামীম, যারা স্বপ্ন দেখে 'সারিবদ্ধ বেদুইন তাঁবুর'!! ঠিক ওইজাতীয় স্বপ্নের একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সংস্করণ পশ্চিম-বঙ্গে তথা ভারতে যুগ-যুগ ধরে চালু আছে। শামীমের ভাষায়, 'রোগ-শোকদারিদ্র্যলাঞ্ছিত ব্যথাতুর বঙ্গ-জনের মুখগুলোকে এরা ভুলে থেকেছে, চাটুবাক্যের মায়াজাল বিস্তার করে সম্মোহিত করে রেখেছে এই চিরসবুজ দেশটির চিরসরল মানবসন্তানদের।' সুতরাং, এই মিথ্যা স্বপ্নটি কারা-কারা ছড়াচ্ছেন, বাঙালির যাবতীয় সংস্কৃতির উৎস হিসাবে কারা ওই মিথ্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, তাঁদেরকে সুচিহ্নিত করতে হবে। (৬) সরাসরি "আর্য" কথাটির উল্লেখ না করেও, আরেকটি কূটপদ্ধতিতে, ওই মিথ্যা স্বপ্নটি ছড়ানো যায়! সেটি হচ্ছে, বাঙালির যাবতীয় সংস্কৃতির উৎস হিসেবে, কথায়-কথায়, কোনো 'উত্তর-পশ্চিম ভারত'-নিবাসী জনগোষ্ঠীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ। আসলে কিন্তু একই ব্যাপার, 'old wine in new bottle'!! কেননা, এ-হেন আর্যরা যে ভারতে এলো, তার গতিপথটি যে 'উত্তর-পশ্চিম ভারত' দিয়েই! ঢাকার রমনা ময়দান ফুঁড়ে বেরুলে তখন 'উত্তর-পশ্চিম ভারত'-এর বদলে ঢাকাই গুরুত্ব

পেত! (৭) বাঙালি সংস্কৃতির উৎস হিসেবে 'সারিবদ্ধ বেদুইন তাঁবুর' দিকে যাঁরা অঙ্গুলিনির্দেশ করেন, তাঁদের যে মৌলবাদী মুসলিম হতে হবে, তার কোনো কারণ নেই। কেননা, ইতিহাসের এহেন ব্যাখ্যা গোপন ব্রাহ্মণ্যবাদীর পক্ষেও সম্ভব, তবে একেবারে "আরব" না বলে তারা বলবে ওই দিক্‌-কারই ইরান-ইরাকের কথা! কেননা, তাতে মুসলিম-মৌলবাদীরাও তৃপ্ত হয় আবার তৃপ্ত হয় বীর্যস্বল্পটিও! কেননা, বীর্যদানকারী ওই রাশিয়ার উরাল পর্বতের লোকগুলির একটি দল যে শুধু ভারতেই ঢুকেছিল তা নয়, ইরানের দিকেও গিয়েছিল। আরবের দিকে যায় নি বলেই জানি। না যাক, মুসলমানদের দেশে তো গিয়েছিল। সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির উৎস হিসেবে যদি ইরানের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করা যায়, তার সঙ্গে যদি গ্যাস হিসেবে জুড়ে দেওয়া যায় "সূর্যবংশ"—"পহ্‌লবী" ইত্যাদি, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদীকে পায় কে!!! এহেন ব্যাখ্যা, শামীমের ভাষায় ওই "শেরওয়ানি"-ওয়ালাদের তৃপ্ত না করে পারে। "বেদুইন তাঁবু" না হোক, ইরান হলেই হল! (এবারের দুর্গাপুজায় হঠাৎ শুনি পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন যে "সিংহবাহিনী মহিষমর্দিনী দুর্গা নিজেই এদেশে বহিরাগত"! তার জন্মস্থান নাকি তুর্কীদের দেশে!!! কী ব্যাপার কে জানে, তবে ব্রতীনবাবু যে "শের-ওয়ানি"-ওয়ালাদের কাছে বিশেষ প্রিয়পাত্র তথা বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। (দ্রষ্টব্য : ১৪.১০.৯১ তারিখে "দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা"র সঙ্গে প্রদত্ত ক্রোড়পত্র)। (৮) দীনেশচন্দ্র-শহীদুল্লাহ্‌-ক্ষিতিমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় অবহিত থাকলেই বোঝা যাবে যে, বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদ আসলে কী। দেখা যাবে, বাঙলার যা কিছু নিজস্ব সম্পদ, সেখানেই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শরিকানা অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্ববিরোধী উপাদানে পূর্ণ। গোপন-বিচ্ছিন্ন-বাদী শক্তির কাছে এগুলি যে একান্ত পরিত্যাজ্য তা তো সহজেই অনুমেয়।

বাঙালির একান্ত নিজস্ব সম্পদগুলি কী? সংক্ষিপ্তম পরিচয়, ক্ষিতিমোহন সেন-এর ভাষায়, প্রেমেই সাধনা, দেহকর্ষণ ব্যর্থ, কায়াযোগই সাধনীয়, বাহ্য-দেবতা মন্দির পূজা সবই ব্যর্থ, বাহ্য-আচার সম্প্রদায় সবই নিষ্ফল। এসব মতবাদ বেশি করে ছিল এই বাঙলাদেশেই। বাঙলার নাথ-যোগীদের মধ্যে এইসব মতই চলে আসছিল। কবীর প্রভৃতির ধারাও এই দলের। নাথ-যোগীরা নামেমাত্র মুসলমান হয়ে জোলা বনে গিয়েছিলেন। জোলা শুধু একটা জাতি নয়। তখন জোলা বলে সাধক-সম্প্রদায়-ও ছিল।...এখনও কাশী প্রদেশে ভগরী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তারা নাকি ভর্তৃহরির অনুবর্তী যোগী সম্প্রদায়। এখন শুধু নামে তারা মুসলমান। অথচ হিন্দুদের কোনো উৎসবই তাদের গান ছাড়া সম্পন্ন হয় না। কায়াযোগ ও প্রাকৃত পথসহ এইসব মরমীবাদই বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব। ("বাংলার সাধনা", ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৭৯, পৃ. ৩৩-৩৪)।

(৯) "কুক্কুরজাতীয়"-দের সুচিহ্নিত করতে হলে, পশ্চিমবঙ্গের দিকেই বেশি করে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশের দিকে নয়। কেননা, "কুক্কুরজাতীয়"রা যে পশ্চিমবঙ্গেই অধিকসংখ্যায় বাস করে, তার অন্যতম প্রমাণ এই যে, দীনেশচন্দ্র ক্ষিতিমোহনের বহু গুরুত্ব-পূর্ণ বই পশ্চিমবঙ্গের বহু লাইব্রেরি থেকে লোপাট করে দেওয়া হয়েছে। আর, অজ্ঞ সাধারণ মুসলমানদের খুশি করবার জন্য কোনো-কোনো লাইব্রেরিতে শহীদুল্লার দু-একটি বই রাখা হয়েছে, যেহেতু, শহীদুল্লা "বাঙালি" হিসেবে নয়, "মুসলমান", এবং "মুসলমানদের বুদ্ধিজীবী" হিসেবেই পশ্চিমবঙ্গের বাজারে বহুকাল ধরে প্রচারিত! সমগ্র বাঙলার স্বার্থে, ঢাকার "বাংলা অ্যাকাডেমি"র শ্রদ্ধেয় কর্ণধার-দের কাছে একান্ত আবেদন, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা

যাতে এই দুই মহাপ্রাণের রচনাবলী সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন, তাঁরা তার ব্যবস্থা করুন। আন্তর্জাতিক কপিরাইট অনুযায়ী, বাংলাদেশ-ও এখন দীনেশচন্দ্রের রচনাবলী ছাপতে পারেন।

দেবাশিস নাথ
আসানসোল-৭১৩ ৩০৩

২

গৌরী আইয়ুব জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন

শ্রীযুক্তা গৌরী আইয়ুবকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রবীন্দ্র-গবেষণার 'অভিনব' ধারার বিরুদ্ধে তিনি যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তা অসংখ্য সাধারণ রবীন্দ্রানুরাগীর ক্ষুব্ধ হৃদয়ের প্রতিফলন।

রবীন্দ্রগবেষণার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস-যোজনার কোনো সার্থকতা আমরা দেখি না যে শুধু তাই নয়, আমাদের মতে ওই গবেষণাকর্ম রবীন্দ্র-অবমাননার পর্যায়ে নেমে এসেছে। শ্রীমতী কেতকী কুশারী ডাইসনের ওই অভিনব গবেষণাকর্ম দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর আমরা কয়েকজন একটি বহুল-প্রচারিত পত্রিকার চিঠিপত্র বিভাগে আমাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছিলুম। আনন্দপুরস্কারপ্রাপ্তা লেখিকার সম্পর্কিত চিঠিটি ওই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। তদবধি আমরা দেশের কোনো রবীন্দ্রানু-রাগীর অপেক্ষায় থেকেছি। শ্রীযুক্তা আইয়ুব উক্ত গবেষণাকর্মের সমালোচনা করে জাতীয় কর্তব্যপালন করেছেন বলে আমাদের ধন্যবাদার্হ।

অশনি-অনামিকার কাহিনীটি সাহিত্যপদবাচ্য তো নয়ই, স্থূলতায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকেও হার মানিয়েছে। এমন একটি কুশ্রী বিষয়কে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যুক্ত করায় আমরা ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করেছি। এই গবেষণাকর্মটির সপক্ষে কোনো-কোনো নামী বিদগ্ধ ব্যক্তির সার্টিফিকেট আমাদের হৃদয়-পরিবর্তন করতে পারে নি।

রবীন্দ্রনাথ যদৃচ্ছ ব্যবহৃত হওয়ার বিষয় নন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীযুক্তা কুশারী তাঁর জীবৎ-কালেই দেখতে পাবেন তাঁর অভিনব গবেষণাকর্মটি সুধীসমাজে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। আনন্দপুরস্কার বা দু-একজন 'বিদগ্ধ' ব্যক্তির সার্টিফিকেট তাকে বাঁচাতে পারবে না। সাহিত্য-সংসারে যে বাঁচে সে আপন প্রাণশক্তিতেই বাঁচে, পিঠচুলকানি বা হাততালিতে নয়।

মুক্তি রায়
(দর্শন বিভাগ, এম. জি. মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর),
ড. দিলীপকুমার দত্ত
(বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এম. জি. মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর),
শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী
(বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এম. জি. মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর),
শাশ্বতী মিত্র
(সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ, মেদিনীপুর),
সুজাতা চক্রবর্তী
(দর্শন বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদিনীপুর)।

৩

'ভারতবর্ষ ও ইসলাম'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের বক্তব্য

"চতুরঙ্গ" ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যায় শ্রীগৌতম নিয়োগীর "ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা" এবং আমার লেখা "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন গৌতম ভদ্র। ওই সমালোচনাতে প্রথম বইটি সম্বন্ধে প্রায় ৩০০ শব্দ, দ্বিতীয় বইটি সম্বন্ধে প্রায় ২০০ শব্দ এবং সাধারণভাবে 'বিজ্ঞানসম্মত' ও 'ধর্মনিরপেক্ষ' ইতিহাস সম্বন্ধে প্রায় ২০০ শব্দ খরচ করেছেন সমালোচক।

বোঝাই যাচ্ছে যে, শ্রীভদ্র প্রতি পৃষ্ঠায় ৩৮ পংক্তি হিসেবে ৩০০ পৃষ্ঠার "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" বইটি সম্বন্ধে ২০০ শব্দের বেশি খরচ করতে অনিচ্ছুক। কেন অনিচ্ছুক? বইটি কি অধিকতর বিশদ আলোচনার অযোগ্য? তাহলে তো এই সোজা কথাটা স্পষ্ট করে ছোট্ট একটি মন্তব্য দিয়ে ২০০ শব্দ খরচের কষ্ট এবং "চতুরঙ্গে"র জায়গা নষ্ট এড়াতে পারতেন। এড়ান নি কেন? তাহলে কি আক্রমণাত্মক লেখার সুযোগটা তিনি হাতছাড়া করতে চান নি বলেই নিজের এতটা শ্রম আর সময় খরচ করেছেন? নাকি অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মতো "চতুরঙ্গে"র নির্বন্ধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়ে তিনি এই সমালোচনা লিখেছেন? হবেও বা। ভদ্রতা রক্ষার দায় ভদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে বড়ো দায়। কিন্তু ভদ্রতা রক্ষার দায় রক্ষা করতে গিয়ে শ্রীভদ্র কী বস্তু দাঁড় করিয়েছেন?

বস্তুটির প্রথম অনুচ্ছেদেই শ্রীভদ্র লিখেছেন, 'সুরজিৎবাবুও মৌলবাদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন ভেবেই বইটি লিখেছেন।' কিন্তু আমার সন্দেহ যে শ্রীভদ্র "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" বইটি না পড়েই মন্তব্যটি করেছেন। কারণ আমি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে দুটি পৃথক জিনিস বলেছি এবং মৌলবাদের একটা সংজ্ঞার্থ দিয়েছি, 'একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোনও বিশেষ গোষ্ঠী যখন সংগঠিত ভাবে রাষ্ট্রীয় শক্তি কুক্ষিগত করার উদ্দেশ্যে সত্য পরিত্যাগ করে তথা ইতিহাস ও বিজ্ঞানচর্চার বিরোধিতা করে নিজেদের উদ্ভাবিত মতকে জনসাধারণের উপর স্বর্গতত্ত্বরূপে আরোপ করে তখন সেই পরিস্থিতির পেছনে নিহিত চালক-শক্তিকে অর্থাৎ যাকে কেউ-কেউ 'একচাল-কানুবতিত্ব' বলেন তাকে মৌলবাদ বলে নির্ণয় করা উচিত।' (ভূমিকা) এই মৌলবাদের জন্ম ভারতে হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর অযোধ্যার একটি মসজিদে রামচন্দ্রের মূর্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কোনো মতবাদের কোনো জন্মদিন থাকে না জেনেও আলোচনার সুবিধের জন্যে আমি একটা সন-তারিখ দিয়েছি। একথাও লিখেছি যে আধুনিক মৌলবাদের জন্ম হয় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত নায়েগ্রা কনফারেন্সে, কিন্তু তা তীব্র আকার ধারণ করে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এবং এ প্রসঙ্গে "হিস্ট্রি অফ ফানডামেনডালিজম" ও "মর্ডানিজম ভার্সেস বাইবল ক্রিস্টিয়ানিটি" গ্রন্থ দুটির উল্লেখও করেছি। আমার সংজ্ঞার্থ অনুসারে "ভারতবর্ষ ও ইসলামে" মৌলবাদের আলোচনা দু পৃষ্ঠার বেশি নয়। আমার কাহিনী শেষ হয়েছে গান্ধীহত্যায়। তাই মনে হয় যে বইটি না পড়েই, আগে থেকেই কিছু একটা ভেবে নিয়ে "ভারতবর্ষ ও ইসলামে"র বক্তব্য সম্বন্ধে শ্রীভদ্র মন্তব্য করেছেন।

সমালোচনার চতুর্থ অনুচ্ছেদে শ্রীভদ্র যা বলেছেন তার অর্থ হল অতীত ভারতকে 'বড়ো সুখের জগৎ' বলেছি এবং আরও বলেছি যে 'ইংরাজ শাসক ও কিছু কুচক্রী রাজনীতিবিদ' সুখের সেই জগৎটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এটাও "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" সম্বন্ধে শ্রীভদ্রের উর্বরমস্তিষ্কপ্রসূত একটা ধারণা। আলোচ্য গ্রন্থে লিখেছি, 'অবশ্য বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টির জন্যে ইংরেজদের অভিযুক্ত করা একটি জনপ্রিয় রীতি।' (পৃ. ২৫০) প্রকৃতপক্ষে ভারতের ইতিহাসে ইংরেজদের ভূমিকার মূল্যায়ন এক কথায় হয় না। যদি তিনি আমার বইটি পড়তেন তাহলে আমি যে-মতের বিরোধিতা করছি সেটাকেই আমার মত বলে ধরে নিয়ে তিনি ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতেন না।

"ভারতবর্ষ ও ইসলাম" যে তিনি পড়েছেন তা প্রমাণ করার জন্যে শ্রীভদ্র বইটি থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রথম উদ্ধৃতি মুঘল সাম্রাজ্যে পতনের কারণ সম্পর্কে আচার্য যদুনাথ সরকারে বহুমান্য বিচারের থেকে পৃথক আমার নিজস্ব বিচার। আমি মনে করি, শাসকশ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র ভাবে শাসিত-

শ্রেণী ভারতবর্ষে একটা নিজস্ব সত্য অনুধাবন করে সেই সত্যেরই সন্ধান করেছে। দারা শিকোহর মধ্যে দেখি ভারতীয় জনসত্যের মহান প্রকাশ। তাঁকে হত্যা করে ঔরঙ্গজেব ভাবগত অর্থেও ভারতীয় জনসত্যকে হত্যা করেছিলেন। কালক্রমে সমস্ত সাম্রাজ্যেরই পতন হয়, কিন্তু কালক্রম ছাড়াও থাকে আশুকারণ। আমার মতে ভারতীয় জনসত্য থেকে বাদশাহী বিচ্ছেদই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের আশু কারণ। আচার্য সরকার নিরপেক্ষ শ্রীভদ্রর কোনো মত আছে কিনা তা তাঁর লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

"ভারতবর্ষ ও ইসলাম" থেকে শ্রীভদ্র অপর যে-উদ্ধৃতিটি তুলেছেন তা হল, 'সঙ্গত কারণেই সন্দেহ হয় যে এই সরল ও সুদৃঢ় একেশ্বরবাদ শঙ্করাচার্য ইসলাম ধর্ম থেকেই পেয়েছিলেন।' উক্তিটি দেখে তিনি আঁতকে উঠলেন কেন? এখানে তাঁর মতটা বোঝা যাচ্ছে। তাঁর মতে এ বিষয়ে 'নানা অন্য সূত্র থাকার সম্ভাবনা' আছে। আছেই তো। সেজন্যে আমি 'সন্দেহ' শব্দটা ব্যবহার করেছি। শ্রীভদ্র কি বাঙলা 'সন্দেহ' শব্দটার অর্থ জানেন না! "ভারতবর্ষ ও ইসলামে" আমি একথাও লিখেছি, 'এ নিয়ে গভীরভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধানের পর্যাপ্ত অবকাশ আছে, তবে আমাদের এই ঐতিহাসিক সমীক্ষায় ঐ জাতীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসার বিষয়ে কূট আলোচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয়।' শ্রীভদ্র যদি 'অদ্বৈতবাদ' এবং 'একেশ্বরবাদ' এক জিনিস কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতেন তাহলে বোধ হয় বোঝা যেত যে তর্কের বিষয়টা তিনি বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি 'তাসের দেশে'-র রাজা, প্রশ্ন করেন না, নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে আঁতকে ওঠেন।

'ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে গাত্রে হল ব্যথা।' সমালোচনার শেষ ২০০ শব্দের অংশে আসি। এখানে আবার বলেছেন যে এই দুটি গ্রন্থ পড়লে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে কী মনে হয়? 'সেই সময়টা বড়ো সুখের ছিল।' তাঁর লেখা পড়ে আমার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত কবিতাটির কথা মনে হল যাতে বলা হয়েছে যে সে বড়ো সুখের সময় যখন নেশায় চুর মধ্যরাতে ফুটপাথ বদল হয়। শ্রীভদ্রও উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে অদলবদল করে আর নিজের মনগড়া ধারণা অন্যের রচনা বলে কল্পনা করে বড়ো সুখ পেয়েছেন।

অথচ "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" গ্রন্থটিতে এমন অনেক কথা আছে যা ইতিহাসের প্রচলিত বাঙলা বইগুলিতে নেই। ইসলাম ধর্ম উত্তর-ভারত দিয়ে প্রবেশের আগেই শান্তিতে বাণিজ্য-অভিলাষীদের ধর্ম হিসেবে দক্ষিণ ভারত দিয়ে প্রবেশ করে। ভারতযাত্রী প্রথম মুসলমানরাই বর্তমান ক্র্যাঙ্গানোরের কাছে ভারতের প্রথম মসজিদটি নির্মাণ করেছিল। গজনীর সুলতান মাহমুদকে আমি সমুদ্রগুপ্তের চেয়ে অনেক বড়ো ব্যক্তিত্ব বলে মনে করি—কারণগুলি গ্রন্থটিতে উল্লেখ করেছি। ইসলাম ধর্ম ও ইসলামধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সংযোগের পরে, ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়ারূপে, ভারতবর্ষের ভাষায় সাহিত্যে চিত্রশিল্পে স্থাপত্যে ধর্মচিন্তায় অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনধারাতে যেসব নতুন বৈশিষ্ট্য ও নতুন লক্ষণ ফুটে উঠল তার বিবরণ গ্রন্থটিতে আছে। আমি বলেছি যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে এমন এক জনসত্য বা লোকসত্য গড়ে ওঠে যার মূল কথা হল ঐক্য, মিশ্রণ ও সংহতির সন্ধান। আর একটু খুলে বলতে পারি যে "ভারতবর্ষ ও ইসলামে"র বিষয় হল প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন বিদেশী জাতি ও শোণিতের মিশ্রণ-প্রক্রিয়ার উল্লেখ করে মধ্যযুগে বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতি আত্মীকরণ-প্রক্রিয়ার বিবরণ এবং আধুনিক যুগে বিদেশী শাসনে রাষ্ট্রীয় চেতনার জাগরণের ফলে উদ্ভূত নতুন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপসন্ধান। অবশ্যই মূলকথা ছাড়া অন্য কথাও ছিল। কিন্তু স্থানাভাবও ছিল।

আধুনিক যুগের প্রসঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ও ধারণার উল্লেখ করেছি যেগুলি বিশেষ প্রচলিত নয়।

সেগুলির এখানে খুব সংক্ষেপে একটু উল্লেখ করি। চিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ এক নতুন বাস্তববাদী ধর্মবোধের ডাক দেওয়ার দু বছর পরে মার্কিন মুলুকে অনুষ্ঠিত মৌলবাদীদের নায়েগ্রা কনফারেন্সের সমকালে আর্যসমাজীদের "পাঞ্জাব" নামক পত্রিকায় ধর্মের ভিত্তিতে জাতি তথা দেশ গঠনের ডাক দেওয়া হয়। একই কালে পশ্চিম ভারতে টিলকের নেতৃত্বে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় তারও লক্ষ্য ছিল ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের মিলন ঘটানো। এভাবেই ভারতে রাজনীতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে এসেছে ভাষার প্রশ্ন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে জাত হিন্দি ভাষা যেভাবে ১৮০০ থেকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবধী মৈথিলী ব্রজভাষা প্রভৃতির ধনসম্পদ লুঠ করে নিজের গৌরব বাড়িয়েছে তাতে উর্দুভাষীরা নিজেদের মাতৃভাষার ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেয়েছে—শুধু হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের শাসন থেকে নয়, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীদের শাসন থেকে মুক্তির খোঁজে সন্ত্রস্ত মুসলমানরা পাকিস্তান আন্দোলনের পথে পা বাড়িয়েছে। স্বভাবতই এই মুসলমানরা গান্ধীর নেতৃত্বে আস্থা রাখতে পারে নি এবং সন্দেহ করেছে যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা প্রথম সুযোগেই ব্যবহৃত গান্ধীকে পরিত্যাগ করবে। এটাও লক্ষণীয় যে যুক্তপ্রদেশ / উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুসলমানরাই পাকিস্তানি আন্দোলনে সবচেয়ে উগ্র ছিল, কারণ—আমার মতে—এই অঞ্চলেই হিন্দি আগ্রাসন সবচেয়ে উগ্র ছিল।

হিন্দি আগ্রাসনের আতঙ্ক বাঙলার মুসলমানদের মধ্যে তেমন কার্যকর হয় নি একথাও সত্য। কিন্তু পঞ্চাশের মন্বন্তরে গ্রাম-বাঙলার মানুষ তাদের চিনে ফেলল। ওই মন্বন্তরে শয়তান কারা ছিল তা বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা থেকেই জানা যায়। নোয়াখালির আর্থিক শোষণ ও দাঙ্গার কার্যকারণ বোঝা যায় অন্নদাশঙ্করের "ক্রান্তদর্শী" উপন্যাসটি থেকে। নোয়াখালির প্রসঙ্গে এসেছি গান্ধীর প্রসঙ্গে। এই প্রসঙ্গের শেষে "ভারতবর্ষ ও ইসলামে" লিখেছি যে পরপর তিনটে গুলিতে 'ভারতবর্ষের ছিন্নভিন্ন মানচিত্রের মতো লুটিয়ে পড়ল গান্ধীজীর রক্তাক্ত শরীর।' এখানেই "ভারতবর্ষ ও ইসলামে"র ইতিহাস শেষ। বইটির শেষ বাক্য হল, 'ধর্ম ও ভাষার প্রশ্নে ভারত উপমহাদেশ ইতিমধ্যেই তিনটি সার্বভৌম খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে: আরও বিভক্ত হবে কি হবে না, তা নির্ভর করছে জনসাধারণের সংহতি-চেতনা ও সহনশীলতার অর্থাৎ লোকসত্যের পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও সম্প্রসারণ ক্ষমতার উপর।'

কোনও ইতিহাস সম্পূর্ণ নয়। লিখিত অংশের বাইরে বহু তথ্য অলিখিত থেকে যায়। কিছু বর্জন ঐতিহাসিকের ইচ্ছাকৃত, কিছু অজ্ঞতাপ্রসূত, কারণ কিছু তথ্য অজ্ঞাতই থেকে যায় চিরকাল। এত কাছের ঘটনা ভাগলপুর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সব তথ্য উদ্ধার করা যায় নি। বহু আধুনিক তথ্যানুসন্ধান-পদ্ধতি প্রয়োগ করেও উন্মোচন করা যায় নি সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে হত্যার অথবা বোফর্স বাণিজ্যের মতো বিখ্যাত রহস্যগুলি। আবার অনেক সময় প্রাপ্ত সূত্রগুলি অথবা পারিপার্শ্বিক প্রমাণগুলি থেকে ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করতে হয়। ইতিহাস মানে ক্রমাগত সত্যানুসন্ধান। "ভারতবর্ষ ও ইসলাম" সেই সত্যানুসন্ধানেরই এক প্রচেষ্টা।

সুরজিৎ দাশগুপ্ত
প্রযত্নে ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২ বিধান সরণি,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

গানের ভুবন

মান্না দে ও তাঁর গান

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মান্না দে। বাঙলা আর হিন্দি দুই ভাষার সঙ্গীত তথা বাঙলা আর মুম্বাইয়ে (বোম্বাইয়ে) সমান জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে। বাঙলার শিল্পী হলেও মুম্বাইতেই মান্না দে জনপ্রিয়তার পাদপ্রদীপে এসে দাঁড়িয়েছেন আগে। বাঙলা আধুনিক এবং চলচ্চিত্র —উভয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রেই মান্না দের অনায়াস চলাচল।

কলকাতার শিমলা পাড়ায় ১৯২০ সালে জন্ম প্রবোধ দে-র। সঙ্গীতের জনপ্রিয় "মান্না" দে তখনও হন নি তিনি। সঙ্গীতজগতে প্রবেশ কাকা বিখ্যাত অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে-র হাত ধরে। ১৯৪০ সালে গায়ক হওয়ার আশায় বোম্বাই যান নেপথ্য-গায়ক হওয়ার ডাকে। কিন্তু সেই সময় সঙ্গীতজগতের দিকপালদের সঙ্গে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে নিজের স্থান করে নেওয়া ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু ভাগ্যক্রমে মান্না দে-র সঙ্গীতপ্রতিভার খোঁজ পান তৎকালীন চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক বিজয় ভাট। তিনিই মান্না দে-কে চলচ্চিত্রের নেপথ্য-গায়ক হওয়ার পথে হাত ধরে নিয়ে আসেন। আরও একজন সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে-কে তৈরি করায় সাহায্য করেছেন---তিনি শচীন দেববর্মন। শচীন দেববর্মন মান্না দে-কে দিয়ে "মশাল" ছবিতে 'উপর গগন বিশাল' গানটি গাওয়ান এবং এই গানের জনপ্রিয়তা মান্না দে-কে খ্যাতির সোপানে উত্তীর্ণ করে।

এরপর আর মান্না দে-কে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। বিভিন্ন ভাষায় তিনি গেয়েছেন অসংখ্য গান। বাঙলা গানেও কাব্যধর্মী, রাগাশ্রয়ী এবং পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সুরাশ্রয়ী সঙ্গীতে অপরূপ কণ্ঠদান করে গানকে এক নতুন মাত্রায় তুলেছেন। বাঙলা গানের জগতে মান্না দে-র গানে পাওয়া যায় এক রোমানটিক স্বাদ, যা শ্রোতাদের সহজেই আপ্লুত করে।

কেবল আধুনিক রোমানটিক গানই নয়, মান্না দে বিভিন্ন প্রয়োজনে গেয়েছেন নানা ধরনের সঙ্গীত। ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করতে মান্না দে পরিবেশন করেছেন কয়েকটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত, হিন্দি আর বাঙলা ভাষায়। সঙ্গে-সঙ্গে নতুন স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের জন্মলগ্নে সলিল চৌধুরীর কথা ও সুরে গেয়েছেন জনপ্রিয় গান: (১) সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর হে বিধাতা; (২) ও ভাই ভাই রে।

ষাটের দশকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে বাঙলা সঙ্গীতের আসরে স্থান করে নেওয়া ছিল অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তা সত্ত্বেও মান্না দে স্থান করে নিয়েছেন তাঁর পরিশীলিত কণ্ঠ আর উন্নততর উচ্চারণশৈলীর কারণে। রাগাশ্রয়ী গানের পরিবেশক হিসাবে ভি. শান্তারাম-কৃত "অমর ভূপালী" ছবির বাঙলা সংস্করণে নাম করে "ডাক হরকরা" ছবিতে বাউলধর্মী গান 'ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায় আমি বসে আছি' অসাধারণ গেয়ে, আবার পঙ্কজ মল্লিকের সুরে "তিন ভুবনের পারে" ছবিতে পপ জগতের 'জীবনে কি পাবো না' প্রভৃতি সঙ্গীত অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করে মান্না দে স্বীয় প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন।

মান্না দে-র গাওয়া কয়েকটি জনপ্রিয় গানের শুদ্ধপাঠ এখানে দেওয়া হল। বারান্তরে তাঁর গাওয়া বাঙলা ছায়াছবিতে ব্যবহৃত নেপথ্যকণ্ঠের গানের সঙ্কলন দেওয়ার ইচ্ছে রইল।

আমার না যদি থাকে সুর
তোমার আছে তুমি তা দেবে—
তোমার গন্ধ-হারা ফুল, আমার কাছে সুরভি নেবে।
এরই নাম প্রেম, এরই নাম প্রেম ॥
জীবনে যা গৌরব হয়, মরণেও নেই পরাজয়—ও—
চোখের স্মৃতির মণিদীপ মনের আলোয় কভু কি নেভে।
দুজনেই দুজনাতে মুগ্ধ, দুজনার রূপে কত সুন্দর
দুজনার গীতালির ছন্দে প্রাণমন দুজনার উন্মন ॥
এর কাছে স্বর্গসুধার, বেশি আছে মূল্য কি আর—ও—
আমার দেবতা সেও তাই, প্রেমের কাঙাল পেয়েছি ভেবে।
এরই নাম প্রেম, এরই নাম প্রেম ॥

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘলা মেয়ে মেঘেরই সাজ পরেছে
কার ছায়া তার মনেতে আজ ধরেছে
একতারা ওই কার বাজে, তাই তো হৃদয় আজ নাচে
একলা চলার পথ যেন আজ সঙ্গী করেছে ॥
এই বেলাকার এই খেলাতে মন দিতে সে চায়
কার তরে এই বিদ্যুতেরই মালা গেঁথে যায়
যার লাগি দিশাহারা, পেল নাকি তার সাড়া
তাই বুঝি দুনয়নেতে অশ্রু ঝরেছে ॥

কথা ও সুর : সুধীন দাশগুপ্ত

এই কূলে আমি আর ওই কূলে তুমি
মাঝখানে নদী ওই বয়ে চলে যায়।
তবুও তোমার আমি পাই ওগো সাড়া
দুটি পাখি দুটি কূলে গান যেন গায় ॥
যুগে যুগে তুমি মোরে বেঁধেছিলে ফুলডোরে
তাই আজ বসে থাকি আশায় আশায়।
দূরে আছো তবু কথা হয় বিনিময়
জানো না কি, কী নিবিড় এই পরিচয়।

দেখি আমি চোখ মেলে, মনের মাধুরী ঢেলে
তুমি যে গো ভেসে এলে প্রাণের খেয়ায় ॥

কথা : বঙ্কিম ঘোষ

আমি সাগরের বেলা, তুমি দুরন্ত ঢেউ
বারে বারে শুধু আঘাত করিয়া যাও।
ধরা দেবে বলে আশা করে রই
তবু ধরা নাহি দাও।
জানি না তোমার এ কী অপরূপ খেলা
পাওয়ার বাইরে চলে গিয়ে কেন আমারে কাঁদাতে চাও।
বুঝি আমার মালায় মায়ার বাঁধন নেই
আপন জনেরে আপন করিয়া বাঁধিতে পারি না তাই।
আসে আর যায় কত চৈতালী বেলা
এ জীবনে শুধু মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা
কোন্ সে বিরহী কাঁদে মোর বুকে তুমি কি শুনিতে পাও।

কথা : প্রণব রায়

জানি তোমার প্রেমের যোগ্য আমি তো নই
পাছে ভালবেসে ফেল তাই, দূরে দূরে রই।
আমার এ পথে আছে মরুভূমি ধু—ধু—
আমি কিভাবে বাঁচাবো তোমার মাধুরী ওই
কত পেয়ালা লাঞ্ছনার আমি নীরবে করি যে পান
আর যারা সুধা নিয়ে চলে তুমি দাওগো তাদেরি গান
এমনি বিভেদ কত মনে আসে অবিরত
দুটি ভিন্ন জীবনে মিলিত যে আমি হই।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ক' ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যে তুমি ভালবাসবে
পথের কাঁটায় পায়ে রক্ত না ঝরালে কী করে এখানে
তুমি আসবে
কটা রাত কাটিয়েছো জেগে স্বপ্নের মিথ্যে আবেগে
কী এমন দুঃখকে সয়েছো যে তুমি এত সহজেই হাসবে।
হাজার কাজের ভিড়ে সময় তো হয়নি তোমার
শোননি তো কান পেতে অস্ফুট কোন কথা তার।
আজ কেন হাহাকার করো সে কথায় ইতিহাস গড়ো
কী সুখ জলাঞ্জলি দিয়েছো যে তুমি সুখের সাগরে ভাসবে।

কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বল্ না
ও ঘাটে জল আনিতে যাবো না যাবো না
(ও) সখি অন্য ঘাটে চল্ না ॥
দিবালোকে সে আমায় নাম ধরে ডাকে
আমাকে সবাই দোষে, সে সাধু থাকে।
অসময় সময় কিছু কেন সে বোঝে না
আমি কি তার হাতের খেল্না ॥ (খ্যাল্না)
নিশিরাতে বাঁশি তার সিঁদকাঠি হয়ে
চুপি চুপি ঘরে বসে বাজে রয়ে রয়ে
যখনই ডাকবে সে তখনই যেতে হবে
আমি কি এমনতর ফেল্না ॥ (ফ্যাল্না)
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই তো আবার কাছে এলে
এতদিন দূরে থেকে বলো না কী সুখ তুমি পেলে।
এ কেমন ভালবাসা কে জানে
কী ভেবে গো ব্যথা দিলে এ প্রাণে
নিজহাতে মণিদীপ নিভায়ে, আবার নিজেই দিলে জেলে।
তুমি তো আমায় ভালো চেনো
তুমি ছাড়া কোন গান ভাবতেও পারিনি তা জেনো
তবু যদি ভাবো সবই ছলনা, সেই কথা মুখে কেন বল না
ঝরা মালা কেন দাও পরায়ে, ধুলিতে দাওনা তারে ফেলে ॥
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

তীরভাঙা ঢেউ আর নীড়ভাঙা ঝড়
তারি মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর।
চাঁদ হাসে তাই যেন উল্লাসে ওই
রঙের মাধুরী লয়ে ফুল হাসে ওই।
নিকটের পানে চাহি দূর কাঁদে গো
অদেখার বাঁশরী যে সুর সাধে গো
সবশেষে পল্লবে জাগে মর্মর
তারি মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর ॥
তৃষ্ণারে কাছে ডাকে মরুমায়া গো
ক্লান্তিরে মুছে দেয় তরুছায়া গো
চিরদিনই রয় ব্যথা বন্ধনে হায়
হাসি যেন মিশে আছে ক্রন্দনে হায়।
সৌরভ-গৌরবে ধূপ জলে কই
আলো আর আঁধারেরো খেলা চলে ওই
অন্তরে ধু-ধু করে শুধু বালুচর
তারি মাঝে প্রেম যেন গড়ে খেলাঘর ॥
কথা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

দরদী গো কি চেয়েছি আর কি যে পেলাম
সাধের প্রদীপ জালতে গিয়ে নিজেই আমি পুড়ে গেলাম।
সুখ নামে শুকপাখীটা ধরতে গিয়ে
কিনেছি সোনার খাঁচা যা কিছু সব বিকিয়ে
সোনার শিকল কেটে গিয়ে হায়
সে পাখী আমার যায় উড়ে যায়।
ভাবিনি সেই সে আশার এই পরিণাম ॥
ভুল কি যে না জেনে যাই মাশুল দিয়ে
হিসেবে শূন্য আমার মেলেনি সব হারিয়ে
ললাট-লিখন লিখে বিধাতা নাম কিনেছেন ভাগ্যদাতা
রাখি সেই দাতার পায়ে হাজার প্রণাম ॥
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে নিশুতি রাত গুমরে কাঁদে
মনের ময়ূর মরেছে ওই ময়ূর-মহলে।
দেখি মুকুটটা তো পড়ে আছে রাজাই শুধু নেই ॥
দরবারে তার ছিল আমার সোনার সিংহাসন
আমি হাজার হাতের সেলাম পেলাম পেলাম না তো মন
আজ মখমলের ওই পর্দাগুলো ওড়ায় শুধু স্মৃতির ধুলো
ফুলবাগানের বাতাস এসে আছড়ে পড়ে যেই ॥
আমার নাচঘরে যেই পাগল হত নূপুর তোমার পায়
আমি ইরান দেশের গোলাপ ছুঁড়ে দিতাম তোমার গায়
তুমি শ্বেতপাথরের গেলাস ভরে অনেক সুধা দিতে ধরে
আবার বিষও পেলাম তোমার দেওয়া ওই পেয়ালাতেই ॥
কথা : পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও গান বারান্তরে

ড. বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪২ সালে ১৬ই নভেমবর, ফরিদপুর জেলার (অধুনা বাংলাদেশ) খোকসাহাট গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. এবং পি. এইচ. ডি.। আকাশবাণীর স্বীকৃত গীতিকার। প্রকাশিত অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চট্কা"। বর্তমানে ড. চট্টোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গীত বিভাগের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিগত তিন বৎসর যাবৎ পত্র-পত্রিকার প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটা সত্ত্বেও আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম চতুরঙ্গ যাতে ব্যাপক শুভানুধ্যায়ীদের ক্রয়-ক্ষমতার উপর পীড়াদায়ক না হয়ে ওঠে। কিন্তু সম্প্রতি পত্রিকার প্রকাশনা-ব্যয় আমাদের সাধ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করে গেছে। মূল্যবৃদ্ধি না ঘটিয়ে আর উপায় নেই। চতুরঙ্গের সহানুভূতিশীল পাঠক, গ্রাহক এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমরা তাই মার্জনা-প্রার্থী।

আগামী মে ১৯৯২ সংখ্যা থেকে আমরা চতুরঙ্গ প্রতি কপির মূল্য আট টাকা করতে বাধ্য হচ্ছি। এই সঙ্গে গ্রাহক-চাঁদার হারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে বাৎসরিক সডাক ৯০ টাকা এবং যাণ্মাসিক সডাক ৪৫ টাকা।

এজেন্টদের এখন প্রতি কপি পত্রিকার জন্য চার টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হবে। চাঁদা এবং এজেন্সি অগ্রিম জমা পাঠাবার ঠিকানা ম্যানেজার, চতুরঙ্গ, ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০০ ১৩।